পূজাবার্ষিকী ১৪৩১

বঙ্গশারদীয়া

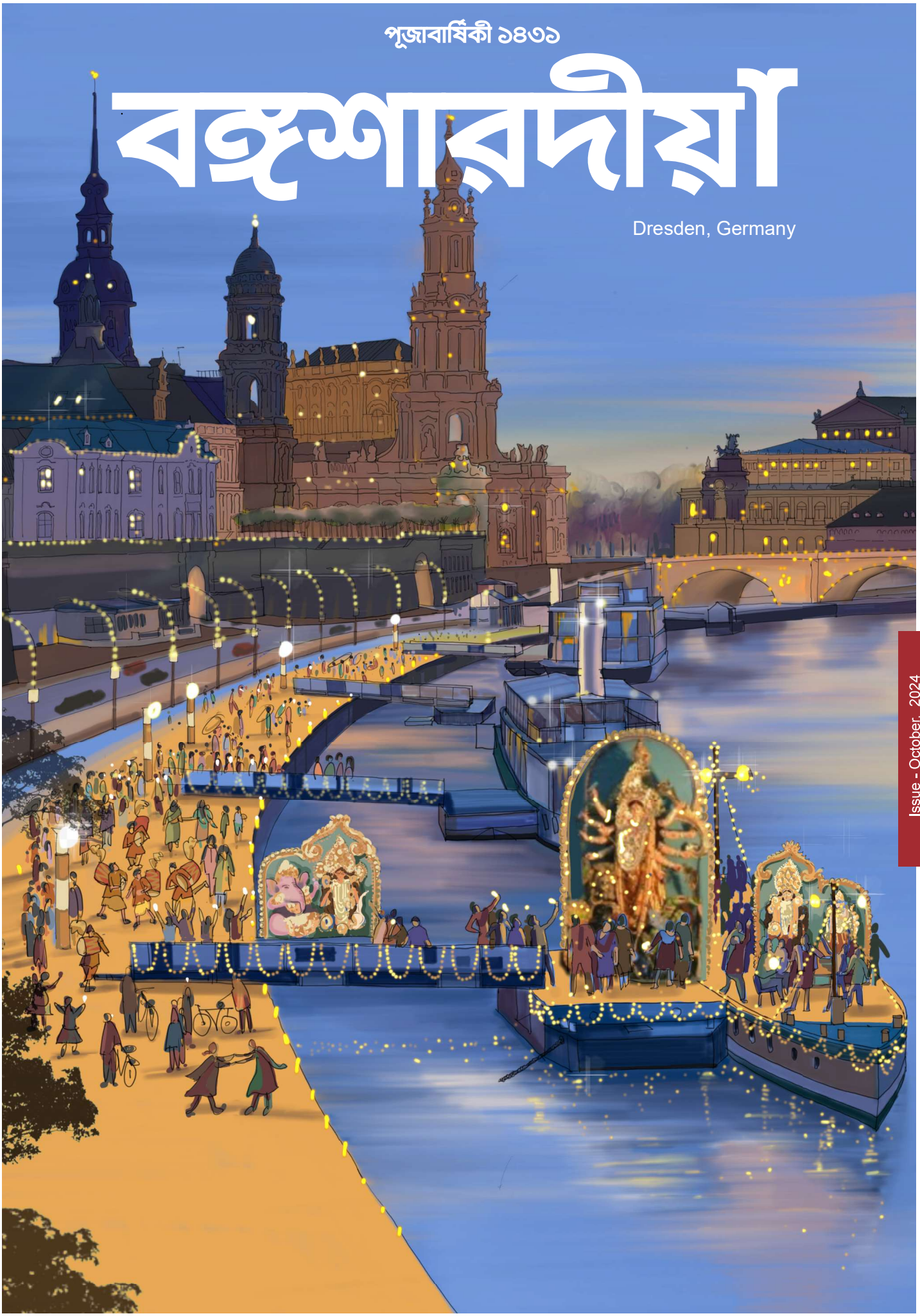

Issue - October, 2024

পূজাবার্ষিকী ১৪৩১

বঙ্গশারদীয়া

ড্রেসডেন

বঙ্গোৎসব ড্রেসডেন

আশ্বিন ১৪৩১

প্রথম প্রচ্ছদ চিত্র - শুভদীপ মাজি

অন্তিম প্রচ্ছদ চিত্র - অর্পিতা চৌধুরী

সম্পাদনা এবং সংকলন : তিয়াস সামুই, প্রণয় মণ্ডল

First Cover Design - Shubhodeep Maji

End Cover Design - Arpita Chowdhury

Editing and compilation : Tias Samui, Pranay Mandal

© B o n g o U s t a v D r e s d e n (B U D) e . V .

সভাপতির কলমে

"ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে" এই প্রবাদ বাক্যটি আমাদের বাঙালিদের ক্ষেত্রেই বোধহয় সবথেকে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ, রাজনীতি, রসগোল্লা আর দুর্গাপুজো, এই চর্চা বা আবেগের জোয়ারে গা না ভাসালে বোধহয় বাঙালির চলে না। আড্ডাপ্রিয় বাঙালির এই রকম কোনো এক আড্ডা থেকেই হয়তো আমাদের 'বঙ্গোৎসব ড্রেসডেন' এর সূচনার ইতিহাস তৈরী হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ২০১৯ এর দুর্গাপূজা দিয়ে এই সংগঠনের পথ চলা শুরু, যদিও ২০২১ এ আমাদের এই সংগঠন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ।

এই নিয়ে আমরা ৬ বছরে পা রেখেছি, বলাই বাহুল্য আমরা শৈশব ছেড়ে কৈশোরের গন্ডিতে এসে পড়েছি তাই শুরুর দিকে আমরা শুধু দুর্গা - লক্ষী - সরস্বতী পুজো বা রবীন্দ্রজয়ন্তীতে সীমাবদ্ধ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে আমাদের অনুষ্ঠানের কর্মসূচিতে অনেক নিত্যনতুন সংযোজন হয়েছে।

দেশ ছেড়ে কাজের সূত্রে প্রবাসে বসবাসের কারণে আমাদের সবার পক্ষে আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বা খাদ্যাভাসের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হয় না আর এই কারণে এই বিশেষ দিনগুলোতে কোথাও গিয়ে আমাদের মধ্যে শূন্যতা কাজ করে, সেই কথা মাথায় রেখেই আমাদের বঙ্গোৎসব কমিটি থেকে গত ২-৩ বছর ধরে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক, ধার্মিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, যাতে কিছুটা হলেও আমরা আমাদের দেশের স্বাদ, গন্ধ ও আনন্দ এখানে বসে উপভোগ করতে পারি। ২০২৪ এ আমাদের কমিটি থেকে 'BUD -Calender' এর সংযোজন করা হয়েছে, যেখানে সারা বছরের অনুষ্ঠানের কর্মসূচি তুলে ধরা হয়েছে।

বছরের শুরতেই বাকদেবী সরস্বতীর আরাধনা দিয়ে আমাদের বঙ্গোৎসভ ড্রেসডেনের অনুষ্ঠানপর্ব শুরু। যে বিদ্যা আমাদের সম্পদ তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনই আমাদের এই পুজোর প্রধান উদ্দেশ্য ।

'বর্ষবরণ' আমাদের সংগঠনের দ্বিতীয় উৎসব। আমরা আজকের দিনে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে অভ্যস্ত হলেও বাঙালির একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা সেই অনুযায়ী পুরো বছরের বার, তিথি, ক্ষণ বা বিশেষ দিনের উল্লেখ আছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের আপামর বাঙালী মিলে 'শুভ নববর্ষ' হিসাবে এই বিশেষ দিনটিতে আনন্দে মেতে ওঠে। সুদূর প্রবাসে বসে আমরাও এই বিশেষ দিনটির আনন্দের ভাগ নিতে কার্পণ্য করি না।

বাঙালী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবে না, এ বোধহয় অকল্পনীয়। যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শয়নে, স্বপনে, স্মৃতিতে ও মজ্জায় ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে রয়েছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমাদের 'BUD' র আর এক পালিত দিবস।

আমাদের বঙ্গোৎসব কমিটি ড্রেসডেনের তত্বাবধানে আয়োজিত সবচেয়ে বড় উৎসব বা অনুষ্ঠান দুর্গাপুজো। গোটা বিশ্বের আপামর বাঙালী এই কয়েক দিনের অপেক্ষায় সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। পুরাণ প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী এটা উমা তার পরিবার বা সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ী আসার আখ্যান হলেও এটা প্রতীকী মাত্র। এর অন্তর্নিহিত অর্থ মা দুর্গার অসুর দমনের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের ভেতরের অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির স্থাপনা যেন করতে পারি, শুধু তাই নয় একদিকে যেমন এই পৃথবীর ভারসাম্য রক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদকূল ও প্রাণীকূল ও সমস্ত স্তরের মানুষের সহাবস্থান লক্ষিত হয় তেমনি সেইসঙ্গে পরিবার-পরিজন পরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয় ভেদাভেদ ভুলে একসাথে আনন্দে মিশে যাওয়ার ও অঙ্গীকার এই পুজো। ২০২৩ এ সুদূর কলকাতার কুমোরটুলি থেকে ড্রেসডেনে দুর্গাপ্রতিমার আনয়ন আমাদের বঙ্গোৎসব কমিটির এক বিশেষ সাফল্য। প্রতি বছর নির্দিষ্ট তিথি মেনে ৩-৪ দিন ব্যাপী এই পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং শেষে বিজয়াদশমী ও ঐশ্বর্য ও ধণ প্রদায়িনী শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপুজো দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। ড্রেসডেন, লাইপজিগ , কেমনিজ ছাড়াও পাশাপাশি ছোট শহর গুলো থেকেও এই কদিন অসংখ্য লোকের সমাগম এই পুজোর আকর্ষণকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। এই আনন্দের দিনে ভোজনপ্রিয় বাঙালির তকমাকে অক্ষুন্ন রাখতে খিচুড়ি, লাবরা, লুচি, আলুরদম, পায়েস , চাটনি , মিষ্টি কোনো কিছুরই কমতি থাকে না।

এছাড়াও ২০২৩ থেকেই আমাদের এই কমিটির উদ্যোগে ফুডকোর্ট চালু করা হয়েছে যেখানে ফুচকা বা ঝালমুড়ি থেকে রসমালাইয়ের রসনাতে সবাই মেতে ওঠে এবং দেশের পুজোর খাঁটি আমেজের থেকে যা কোনো অংশে কম নয়। পুজোর সময় আনন্দমেলা, পুজা শারদীয়া, নবকল্লোল, আনন্দলোক এই সব বই আমাদের ছোটবেলার পুজোর আমেজকে অনেক অংশে বাড়িয়ে দিতো, সেই কথা মাথায় রেখে ২০২২ থেকে আমাদের কমিটি পুজো-ম্যাগাজিন চালু করে। এই ম্যাগাজিনে ছাপানো গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ও আঁকা বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির সহজাত প্রতিভাকে আবার যেন নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে।

জার্মানীর মতো শীতপ্রধান দেশে ক্ষণিকের অতিথির মতো আসা গ্রীষ্মকাল এর গুরুত্ব অনেক । সেইজন্য এই পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে

বঙ্গোৎসব কমিটি থেকে তাদের সদস্যদের জন্য এসকরসান , বার্বিকিউ , ছোটখাটো পিকনিক এবং আউটডোর স্পোর্টস এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালির অবদান অনস্বীকার্য। সেই চিন্তা ও চেতনাকে বিস্মৃত না হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে BUD কর্তৃক আয়োজিত 'Science day' বা 'বিজ্ঞান-দিবস' পালনের কর্মসূচি ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের এই বঙ্গোৎসব কমিটি জার্মানি বা বিশ্বের অন্যান্য বড় বাঙালী কমিটি গুলোর পাশে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমাদের BUDর সমস্ত পুরোনো ও নতুন সদস্যদের, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ভবিষ্যতেও যেন আমরা এই সংগঠনকে আরও অনেক উচ্চতায় পৌঁছে নিয়ে যেতে পারি সেটাই আমার বা আমাদের সবার একান্ত কাম্য হোক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া ড্রেসডেন শহরে দীর্ঘদিন বসবাসের কারণে এই শহরকে এক অদ্ভুত নতুন রূপে গড়ে উঠতে দেখেছি। যেখানে শহরের বেশিরভাগ ভেঙে যাওয়া পুরোনো ইমারত বা অট্টালিকার ভিতকে অক্ষুন্ন রেখে যেমন তার উপরে নতুন অট্টালিকা গড়ে নতুন শহর রূপে সেজে উঠেছে তেমনি এই সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হোক আমাদের নিজেদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির ভিতের উপরে আজকের আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সদর্থক রূপের সহাবস্থান। যেখানে আমরা শুধু বাঙালী বা ভারতীয় হিসাবে নয় জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে আদর্শ মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে উঠি এবং আমাদের জীবনের মন্ত্র হোক উপনিষদের সেই বানী,

"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বাদন্তি "

- শ্রীমতি পাপিয়া দাস
সভাপতি
বঙ্গোৎসব ড্রেসডেন

Vorwärts vom Präsidenten

Es gibt ein berühmtes bengalisches Sprichwort: "Dheki Shorge Geleo Dhan Bhane", was bedeutet: "Gewohnheit ist wie eine zweite Natur". Dieses Sprichwort trifft am besten auf uns Bengalen zu. Ob es nun um Rabindranath (berühmter bengalischer Schriftsteller), Politik, Rasgulla (berühmte bengalische Süßspeise) oder Durga Puja geht – ohne diese Themen zu diskutieren oder sich emotional darauf einzulassen, können Bengalen kaum überleben. Vielleicht begann die Geschichte des 'Bongo Utsav Dresden (BUD)' aus einem solchen Adda (informelles Treffen). Folglich begann die Organisation ihre Reise mit der Durga Puja im Jahr 2019, obwohl sie offiziell im Jahr 2021 Gestalt annahm.

Dieses Jahr treten wir in unser sechstes Jahr ein. Es versteht sich von selbst, dass wir aus der Kindheit in die Jugend gewachsen sind. Während wir uns zunächst auf die Feierlichkeiten von Durga Puja, Lakshmi Puja und Saraswati Puja oder Rabindra Jayanti konzentrierten, haben im Laufe der Zeit viele neue Programme unseren Veranstaltungskalender bereichert. Im Ausland zu arbeiten, fernab von unserer Heimat, macht es oft schwer, unsere kulturellen und sozialen Traditionen oder Essgewohnheiten beizubehalten. Diese Distanz kann uns vor allem an besonderen Tagen ein Gefühl der Leere hinterlassen. Aus diesem Grund organisiert BUD seit 2-3 Jahren verschiedene kulturelle, religiöse und soziale Veranstaltungen, damit wir zumindest teilweise den Geschmack, Duft und die Freude unserer Heimat neu erleben können. Im Jahr 2024 führte unser Komitee den 'BUD-Kalender' ein, der den Zeitplan der Veranstaltungen für das gesamte Jahr aufzeigt.

Zu Beginn des Jahres starten wir den Veranstaltungskalender von BUD mit der Verehrung der Göttin der Weisheit, Saraswati, indem wir tiefen Respekt vor dem Wissen erweisen, das unser Reichtum ist. Das zweite Fest unserer Organisation ist 'Barshoboron'. Obwohl wir uns inzwischen an den gregorianischen Kalender gewöhnt haben, haben die Bengalen ihren eigenen Kalender, der die Tage, „Tithis“ (Mondphasen) und besondere Anlässe im Jahr markiert. Die Bengalen in Westbengalen und Bangladesch feiern diesen Tag als 'Bengalisches Neujahr' mit großer Freude, und auch in der Ferne, in einem fremden Land, scheuen wir uns nicht, die Freude an diesem besonderen Tag zu teilen. Als Bengalen ist es fast undenkbar, nicht an Rabindranath Tagore zu denken, der sich in unseren Träumen, Erinnerungen und tiefstem Inneren widerspiegelt, und wir ehren ihn mit einem weiteren Tag, den unsere Organisation feiert.

Die größte Veranstaltung, die BUD in Dresden organisiert, ist die Durga Puja (Sharodutsav), ein Fest, auf das sich Bengalen weltweit das ganze Jahr über freuen. Der Mythologie zufolge erzählt es die Geschichte von Uma (Durga), die mit ihrer Familie ihr Elternhaus besucht. Symbolisch steht es jedoch für den Triumph des Guten über das Böse und den Sieg der inneren Güte über negative Kräfte. Die Feier bietet auch eine Gelegenheit, dass Menschen zusammenkommen und Unterscheidungen zwischen Familie und sozialen Verbindungen beiseite legen. Im Jahr 2023 war einer der größten Erfolge von BUD der Import des Durga-Idols aus Kumartuli in Kolkata nach Dresden. Jedes Jahr wird die Puja 3-4 Tage lang nach den traditionellen Mondphasen (Tithis) gefeiert und endet mit Bijaya Dashami und Lakshmi Puja, die Wohlstand und Reichtum herbeiruft. Menschen aus Dresden, Leipzig, Chemnitz und den umliegenden Städten strömen zu diesem Ereignis und tragen zur lebhaften Atmosphäre bei. Diese freudigen Tage sind geprägt von Festessen, denn Bengalen genießen ihre Liebe zum Essen mit Khichuri, Labra, Luchi, Alur Dom, Payesh, Chutney und Süßigkeiten. Im Jahr 2023 führte unser Komitee einen Essensstand ein, der traditionelle Köstlichkeiten wie Phuchka, Jhalmuri und Rasmalai anbietet und so die authentischen Aromen einer bengalischen Puja nach Dresden bringt. Seit 2022

veröffentlichen wir auch ein Puja-Magazin mit Geschichten, Gedichten, Reiseberichten und Illustrationen, das den literarischen und kulturellen Geist der bengalischen Gemeinschaft neu entfacht.

In einem kalten Land wie Deutschland ist der Sommer nur ein flüchtiger Gast. Deshalb organisiert BUD während dieser Jahreszeit mehrere Sommerveranstaltungen wie Ausflüge, Grillfeste, Picknicks und Outdoor-Sportarten für seine Mitglieder. Die Bengalen haben unbestreitbare Beiträge zu wissenschaftlichen Errungenschaften geleistet, und um dieses Bewusstsein an zukünftige Generationen weiterzugeben, organisiert BUD die Feier des 'Science Day', die von großer Bedeutung ist. In den letzten Jahren hat sich unsere Organisation neben anderen bedeutenden bengalischen Organisationen in Deutschland und weltweit etabliert. Es besteht kein Zweifel, dass der Verdienst für diesen Erfolg den alten und neuen Mitgliedern von BUD gebührt. Daher ist es unser aufrichtiger Wunsch, diese Organisation in Zukunft noch weiter zu bringen.

Ich lebe schon lange in Dresden, einer Stadt, die im Zweiten Weltkrieg fast zerstört wurde, und habe den bemerkenswerten Wiederaufbau miterlebt. So wie die Ruinen alter Gebäude erhalten und neue Strukturen darum herum errichtet wurden, sollte es unser Ziel in dieser Organisation sein, unsere Sprache, Religion und kulturellen Wurzeln zu bewahren, während wir das positive Zusammenleben von moderner Zivilisation und Kultur fördern. Dabei streben wir danach, nicht nur Träger der bengalischen oder indischen Identität zu sein, sondern Beispiele für eine ideale menschliche Zivilisation zu werden, die über Rasse, Religion und Sprache hinausgeht. Geleitet von der ewigen Wahrheit aus den Upanishaden, „Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti“ – „Die Wahrheit ist eine, die Weisen nennen sie mit vielen Namen“, wollen wir diese universelle Philosophie verkörpern.

Frau Papiya Das,
(Präsidentin)
Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V.

The Spectrum of Bongo Utsav Dresden

Building on the foundation of cultural preservation and celebration, Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V. has continued its voyage of embracing Bengali traditions in Dresden. The past year was marked by not only by a vibrant continuation of our cherished festivals but also exciting innovations and new ventures that highlighted BUD's evolving role as a hub of cultural exchange. As we close this year and prepare for our eagerly awaited annual magazine, "Bongosharodiya", let's look back at the activities that brought us together, from the familiar beats of the 'dhak' to fresh new initiatives that strengthened our bonds as a community.

1.Sharodutsav 2023: Celebrating the Spirit of Bengal with the touch of Kumartuli

Last year's Sharodutsav brought new dimensions while honoring the core essence of the celebration. Held in Dresden-Cotta, attendees in Eastern Germany experienced the arrival of Maa Durga and her four children through the exquisite craftsmanship of Kolkata's Kumartuli artisans. Over 300 participants from Germany and neighboring countries gathered to witness this auspicious occasion. The 3-day event spanned across Saptami, Asthami and Nabami, featuring a vibrant cultural program by members and non-members alike, showcasing performances from various regions of Bangladesh and India, enriching the atmosphere with the diverse rhythms and traditions of our

Durga idol in traditional Bengali style

Members and volunteers preparing lunch

heritage. The event was highlighted by a bustling food court, featuring a delightful array of Bengali savory snacks such as Fuchka, Ghugni, and Jhalmuri, along with traditional sweets like Roshomalai.

Members and volunteers serving lunch

The bhog (offerings to the deity) was provided free of charge, while lunches for each day were lovingly prepared by BUD members and available for a nominal price, ensuring everyone could partake in the festive meals. The festivities were concluded with a vibrant celebration of Lokkhi Pujo, combined with Bijoyasammilani, culminating in a grand feast that brought everyone together in joyful camaraderie.

Dance performance as part of the cultural ceremony

Bengali new year celebration with traditional Bengali dish

2. Barshoboron 2024: Embracing the Bengali New Year

With the onset of the warmth of Spring, we gathered in the beautiful Großer Garten to celebrate Barshoboron, marking the arrival of the Bengali New Year with joy and festivity. The celebration featured an elaborate Lunch, organized by BUD, that delighted our senses, with refreshing mango lassi, savory Singara (Samosas), fragrant Afghani pulao, tender chicken roast, and an array of traditional sweets like Roshomalai and Gulab jamun. The festivities also included a short cultural program that showcased the talents within our community. Participants shared heartfelt recitations, lively songs, and vibrant dance performances, creating an atmosphere filled with laughter and warmth. This celebration not only honored our rich traditions but also strengthened the bonds among our members, setting a positive tone for the year ahead.

All the BUD members pose for photo after celebrating Barshobaron

3. Excursion to Torgau: Nature and Heritage in Harmony

This year, we embarked on a delightful day trip to Torgau, where we immersed ourselves in both nature and history. Our journey began with a generous breakfast provided by BUD, fueling us for the adventures ahead. Upon our arrival, we were greeted by two bears at the entrance of the castle, setting an exciting tone for the day. As we explored the castle and wandered through the charming old town, we ascended the castle tower to enjoy breathtaking views of the Elbe River. This historic site also held profound significance, as it is where American and Soviet troops famously met at the end of World War II. On our way back, we took a moment to relax by the serene lake nestled amidst the woods. The peaceful atmosphere provided a perfect conclusion to our excursion, allowing us to absorb the beauty of nature and reflect on the rich history we had encountered throughout the day.

4. Sunshine and Sizzle: Our Summer Barbecue at the Elbe

As the sun poured its golden warmth over us, we gathered for a joyful barbecue by the enchant-

Members enjoying breakfast on their way to Torgau

ing Elbe River, celebrating the beauty of summer's embrace. The air was filled with laughter and the tantalizing scent of grilling delights, as BUD offered a medley of savory dishes, both vegetarian and non-vegetarian, to delight every taste.

Delicious meat and veggies being grilled

The gentle breeze carried the sounds of sizzling meats and vibrant vegetables, crafting an inviting tapestry of flavors and friendships. Surrounded by the shimmering waters and lush greenery, we in-

dulged in the essence of summer, creating cherished memories that danced in harmony with the day's radiant spirit. While we sipped on the beers provided by BUD, the beautiful riverside provided atmosphere of relaxation and connection within our community.

5. Pre-Puja Potluck: A feast of togetherness

In the vibrant ambiance of Großer Garten, we gathered for a delightful pre-Puja potluck, where each participant brought homemade delicacies that reflected the flavors of our heritage. The afternoon was a joyous celebration of culinary diversity, as we cruised through an enticing spread

BUD members savouring the taste of our rich culinary heritage while enjoying the company of each other

of dishes, each telling its own story of love and tradition. As laughter mingled with the aroma of savory treats, we savored the warmth of community and connection. The day concluded with a spirited session of final planning for the upcoming Sharodutsav 2024, ensuring that our shared enthusiasm would carry us into the festive celebrations ahead.

As we bid farewell to another remarkable year at Bongo Utsav Dresden (BUD), we find ourselves basking in the warmth of shared memories and joyous celebrations. This year has been a beautiful tapestry, woven with vibrant threads of tradition and innovation. From the spirited rituals of Sharodutsav and Basanto Panchami to the festive spirit of Barshoboron, each gathering has been a testament to our resilience and unity. Our excursion to Torgau offered a delightful blend of nature and history, while the summer barbecue brought laughter and connection by the Elbe, creating lasting bonds among mem-

bers. The pre-Puja potluck was a true feast for the senses, celebrating our rich culinary heritage and strengthening our communal ties. As we prepare to unveil our annual magazine, we carry forward the echoes of our shared experiences and the excitement for what lies ahead. Here's to the vibrant heart of BUD, where every moment brings us closer together, and to the adventures that await us in the coming year.

-- With regards,
Papiya Das,
(President)
Jyotirmaya Ijaradar,
(General Secretary)
Rudrarup Bose,
(Treasurer)
Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V.

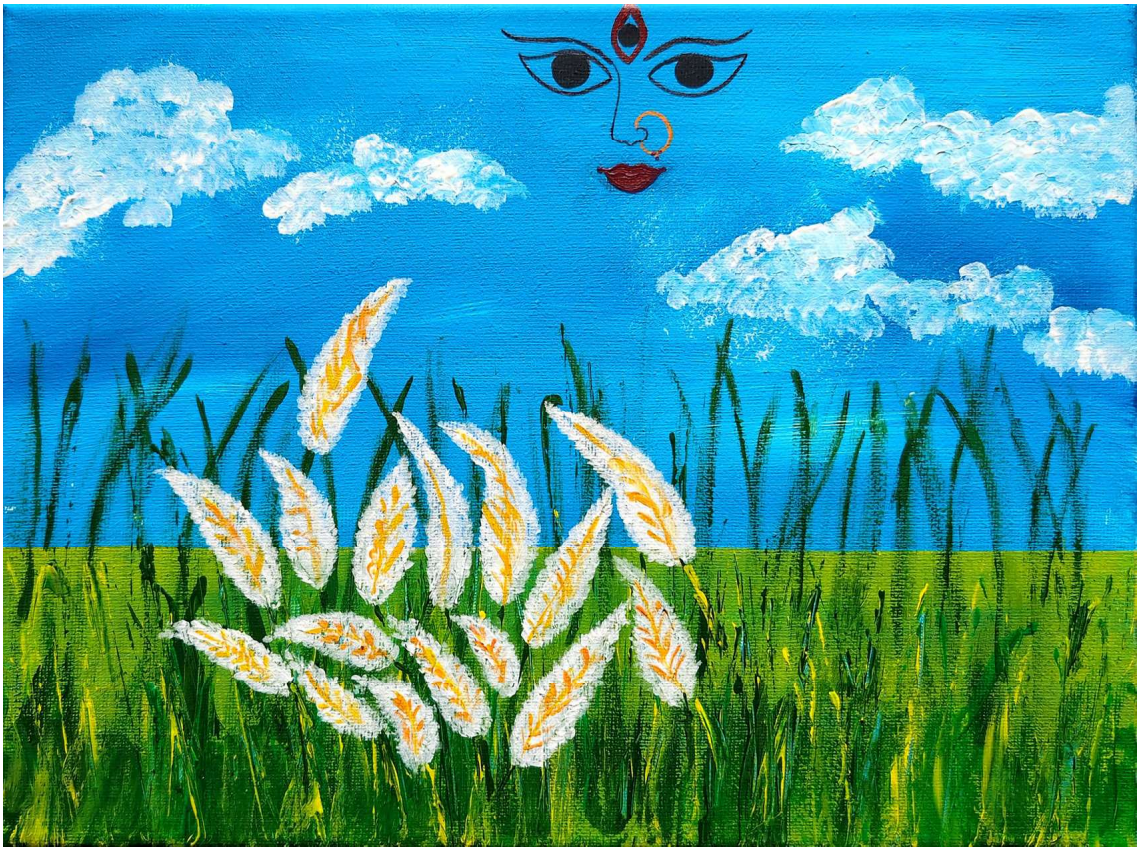

বাজলো তোমার আলোর বেনু
অঙ্কন : মৌমিতা সাহা

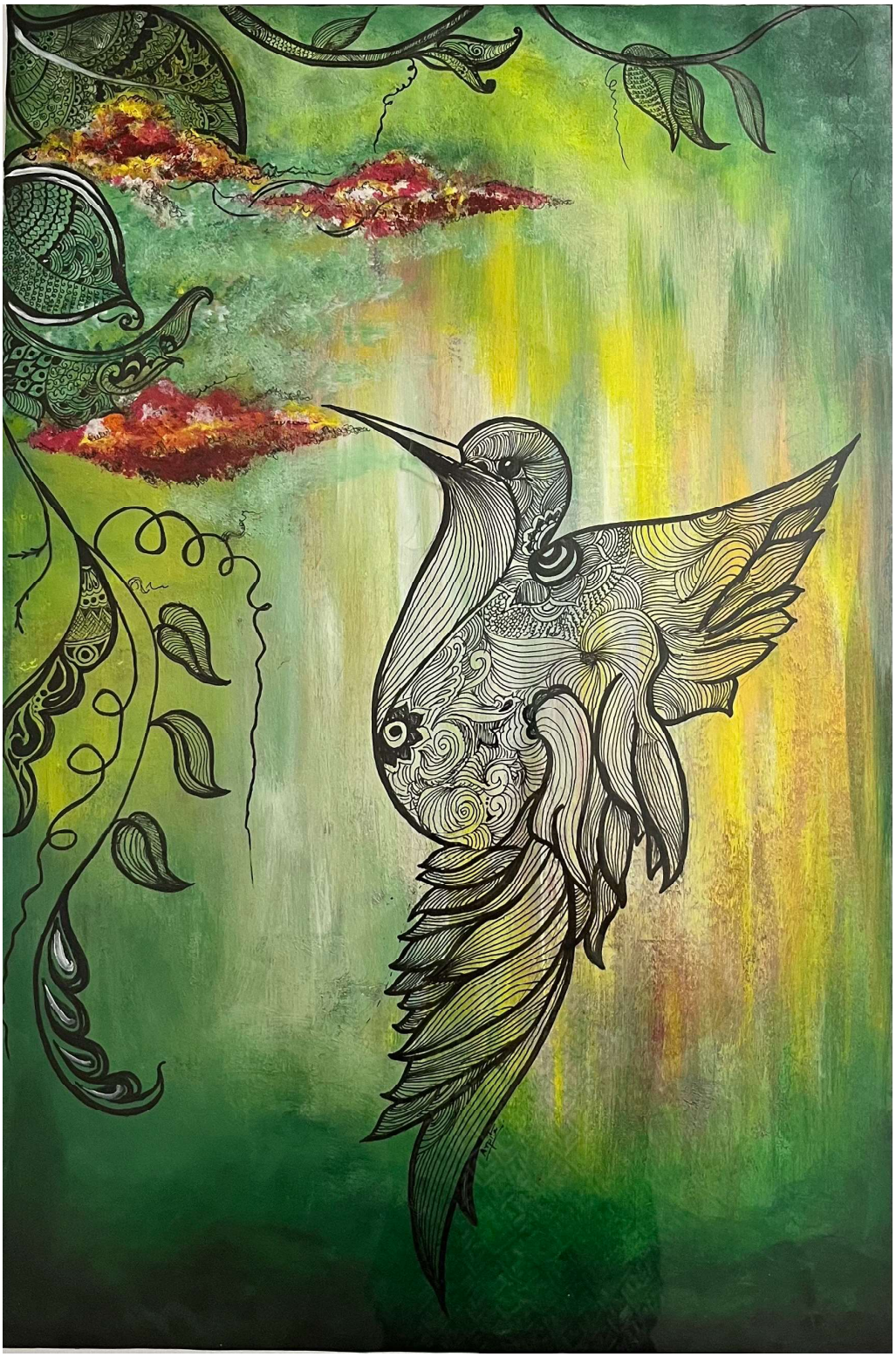

রঙিন স্পর্শ

অঙ্কন : অর্পিতা চৌধুরী

সম্পাদকীয়

গুটি গুটি পায়ে বঙ্গ শারদীয়া ড্রেসডেন এবার পৌঁছে গেল তার তিন নম্বর বর্ষে। আমাদের ছোটবেলায় পুজোর সংখ্যা মানে মনে পড়ে আনন্দমেলা,শুকতারা বা চাঁদ মামা ইত্যাদি। এগুলো পড়েই কেটে যেত পুজোর ছুটির অনেকটা সময়। এগুলোতে থাকতো বিভিন্ন চেনা এবং অচেনা লেখকের নানান রকম গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, কমিকস্ এবং কবিতা। আর একটা বিষয় ছিল সকলের প্রিয়,যা হল বিভিন্ন রকমের রঙিন ছবি, তা সে ফটোগ্রাফি হোক বা হাতে আঁকাই হোক। নতুন জামার মতই নতুন বইয়ের সেই মন ভালো করা গন্ধটা আজও মনে পড়ে। এ ব্যাপারে বঙ্গশারদীয়াও কিন্তু একই ঐতিহ্য বহন করে। প্রতিবছর পুরনো নতুন অনেক মানুষের বহুবিধ প্রতিভা প্রকাশ পায় এখানে। বঙ্গ শারদীয়া নাম হলেও শুধু যে বাংলায় লেখা ছাপা হয় তা কিন্তু নয় বিভিন্ন ভাষার মিলনক্ষেত্র আমাদের এই পূজা বার্ষিকী। বিগত তিন বছরের আকর্ষণের আরেকটা দিক হলো “কচিকাঁচাদের পাতা”। তিন বছরের ধারাবাহিকতায় আমরা দেখলাম কিশলয় গুলো কিভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ পত্রে পরিণত হলো।

আজকাল মানুষের অভ্যাস বদলেছে, হাতে এসেছে মোবাইল, নতুন প্রজন্মের মোবাইল বা ইলেকট্রনিক্স গেজেটস্ ছাড়া বই পড়ার সময় বা ধৈর্য দুই কমেছে। মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে বই পড়ার অভ্যেসটা। তবু সকলকে অনুরোধ করবো বই পড়ুন ও পড়ান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে বঙ্গ শারদীয়া ড্রেসডেন সকলের মনোরঞ্জন করতে পারে এবং লেখাগুলিকে আরও প্রানবন্ত করে তোলার জন্য এই বছর প্রথম কিছু কিছু জায়গায় AI নির্মিত ছবির ব্যবহারও করা হয়ছে । যে সকল শিল্পীরা হাতে হাত রেখে আমাদের সাথে এই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি আমাদের এই প্রয়াস আপনাদের সকলের সেই ছোটবেলার অনুভূতি ফিরিয়ে দিতে পারবে। সবশেষে বঙ্গশারদীয়া ড্রেসডেন ম্যাগাজিন কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এ বছর বঙ্গোৎসবের ষষ্ঠবার্ষিকী, আসুন সবাই মিলে আমরা এই শারদ উৎসবকে আলোক রঞ্জিত করে তুলি।

- তিয়াস সামুই
ও
প্রণয় মন্ডল,
পত্রিকা কমিটি,
বঙ্গোৎসব ড্রেসডেন

পূজাবার্ষিকী ২০২০
বঙ্গশারদীয়া
Dresden, Germany
Issue October 2020
শারদীয়া ১৪২৯
শিল্পাকৃতি
পূজাবার্ষিকী
Annual Magazine
October 2022

সূচিপত্র

ছোট গল্প

টুব্‌লুর শ্বশুরবাড়ী
প্রীতম রায় ১

বালির ঘর
কমল সাউঁই ২১

বিপ্লবের বিয়ে
সুজিত সিকদার ৪৫

অপেক্ষা
চৈতী সিকদার ৫৩

ভ্রমণ কাহিনী

বাটা কাহিনী
শুভদীপ মন্ডল ৯

আমার ব্রাজিল ভ্রমণ
সায়নী দাস ১৫

Griechenland - das magische Land
Aranyasom Das ১৯

Mori Bera--Romance with the Wild
দেবযানী গুহ বসু ৩৩

বিজ্ঞান

Introduction to Future
Eshaan Shyamal ৪৯

TU Dresden : জ্ঞানের সেতুবন্ধন
সৌরভ দেব ৫১

যুদ্ধে গুঁড়িয়ে যাওয়া শহরেও

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

কুহু চক্রবর্তী

ইউরোপের উৎসব

আশ্বিন আসছে, দুর্গাপুজোর বাজনা বেজে উঠেছে প্রবাসেও। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই দুর্গাপুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে ইউরোপের একাধিক দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের কথাতেই প্রায় উঠে এসেছে আরজি করের ঘটনায় সুবিচার চেয়ে প্রার্থনার কথা। শরতের রোদে কোথাও যেন বিষাদের সুর ইউরোপের পুজোতেও।

জার্মানি

এই দেশে সবমিলিয়ে প্রায় ১৫টি দুর্গাপুজো হয়। ইউরোপের অন্যতম বড় এবং পুরোনো পুজোগুলোর মধ্যে একটি হল জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের কোলন শহরের পুজো। বিশাল ক্যাথিড্রালের জন্য বিখ্যাত এই শহরের পুজোর প্রতিমাশিল্পী প্রশান্ত পাল। ৩৩ বছর ধরে কোলনে পুজো করছেন বাঙালিরা। কোলন পুজোর এক উদ্যোক্তা দেবস্মিত বিশ্বাস বলছিলেন, ‘গত বছরে শিপিং কোম্পানির ভুলে লক্ষ্মী এবং কার্তিক চলে গিয়েছিল মেলবোর্নে। তাই মাকে সপরিবারে পুজো করা যায়নি। তবে এবারে সপরিবারে সবাই থাকছেন অর্থাৎ সবক’টি মূর্তিই থাকছে। পুজোর থিমে আরজি করের ঘটনার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পোস্টারেও বিচারের কথা বলেছি আমরা।’ এই পুজো দেখতে নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ এমনকি প্রাগ থেকেও আসেন বাঙালিরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় গুঁড়িয়ে যাওয়া পশ্চিম জার্মানির এসেন শহরে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা। পঞ্জিকা মেনে পাঁচদিনই পুজো করছেন তাঁরা। পুজোয় প্রতিদিন দুপুরে এবং রাতে টিকিটের মাধ্যমে আলাদা আলাদা মেনুসমেত পেটপুজোর ব্যবস্থা রেখেছে ইন্ডিয়ান কালচারাল কানেকশন এসেন। এছাড়াও একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। বার্লিনের মতোই এসেনের প্রথম বছরের পুজোর প্রতিমাশিল্পী মিন্টু পাল। পুজোয় কোনওরকম খামতি রাখতে চাইছেন না উদ্যোক্তারা।

বার্লিনে মোট চারটে পুজো হলেও সবচেয়ে বড় আয়োজন হল ইগনাইটের পুজোতে। পুজোর সঙ্গে জড়িত এক উদ্যোক্তা ইন্দ্রনীল ঘোষ বলেন, ‘প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার লোক হয় এই পুজোয়। এই দুর্গাপুজো স্থানীয় গণেশ মন্দিরে হওয়ার কারণে ভারতীয়, অভারতীয়, বাঙালি সবাই এই পুজোয় সমানভাবে আনন্দ করেন।’ ভারতীয় ডিপ্লোম্যাট, স্থানীয় নেতৃত্বও পুজোয় এখানকার পুজোয় আনন্দ করেন। প্রতিমাশিল্পী মিন্টু পাল। চলতি বছরের পুজোয় কোলনের মতো বার্লিনেও আরজি করের ঘটনার সুবিচারের প্রার্থনা করবেন সকলে। এর পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়নের মতো বিষয়গুলোও এই পুজোর মূল বক্তব্যে তুলে ধরা হবে। বার্লিনের এই পুজোর সব কাজও মূলত মহিলারাই করেন।

ইউরোপের অন্যতম সুন্দর শহর ড্রেসডেনেও গত ছয় বছর ধরে মা আসছেন সপরিবারে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বাঙালিরা একসঙ্গে পুজোর আয়োজন করেন। পুজোর এক উদ্যোক্তা জ্যোতির্ময় ইজারাদার বলেন, ‘বার্লিন বাদে পূর্ব জার্মানিতে ড্রেসডেনের পুজোটাই একমাত্র দুর্গাপুজো। সে জন্য আমাদের এখানে বার্লিন, শেমনিৎস, জেনা, লাইপজিশ, পোল্যান্ড এবং চেক রিপাবলিক থেকেও বাঙালিরা পুজোয় আনন্দ করতে আসেন।’

এ ছাড়াও জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে চারটে, ড্যুসেলডর্ফে দুটো দুর্গাপুজো হয়। এরলাঙ্গেন, মিউনিখ, স্টুটগার্ট মিলিয়েও বেশ কয়েকটা পুজো হয়। হেইলবর্নেও পুজোর আয়োজন করেন বাঙালিরা।

ছবি : মাজিদুর সরদার

বর্তমান

কানাডা থেকে প্রায় ছ’হাজার সাতশো কিলোমিটার দূরে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে জার্মানির বঙ্গ উৎসব ড্রেসডেন নামে এক সংস্থা। এই পুজোর এবার ষষ্ঠ বছর। পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ইতালি সহ নানা প্রান্তের বাঙালি-অবাঙালিরা ভিড় জমান এখানে। পুজো কমিটির এক সদস্য জানান, কুমোরটুলির প্রশান্ত পালের কাছ থেকে আনা হয়েছে মূর্তি। এই ক’দিন থাকছে ভরপেট বাঙালি খাবার। খিচুড়ি, লাবড়া থেকে শুরু করে বাসন্তী পোলাও, রসমালাই।

সূচিপত্র

কবিতা

বিশ্ব নাগরিক
পাপিয়া দাস ৭

কথা
দেবযানী গুহ বসু ৭

হারিয়ে গেলাম
পদ্মনাভ সেন ১৭

যান্ত্রিক শিক্ষা ও সভ্যতা
পাপিয়া দাস ১৭

কষ্ট কল্পনা
ইঞ্জামামুল আরিফ ৩৯

ক্ষোভ
জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী ৪৬

স্বাধীনতার প্রহসন
দেবশ্রী চ্যাটার্জী ৪৬

নাগপাশ
দেবযানী গুহ বসু ৫৬

স্মৃতিচারণা

প্রতিটা ঘর নতুন কিছু বলে
তিয়াস সামুই ১৩

Lock and key
Prantik Mahajan ২৩

কনকচূড়ার আত্মকথা
প্রলয় তারণ দাস ২৫

Feliz Carrera
Rosa Hauch ৪৭

বিবিধ

The Daily Conflicts between Analog Me and Digital Me
Padmanava Sen ৪১

Dresden Spricht Viele Sprachen
Yvonn Spauschus ৪৩

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

টুব্‌লুর শ্বশুরবাড়ী

প্রীতম রায়

ক্লাবে দাঁড়িয়ে একা একাই ক্যারাম পিটছিলো টুবলু, ঠিক তক্ষুনি এসে নেবু হাঁফাতে হাঁফাতে খবরটা দিল,

— টু....টু... টুব্‌লুদা তোমার শ্বশুরমশাই তোমায় খুঁজছেন, শিগগির গিয়ে দেখা করো।

মুহূর্তের মধ্যে টুব্‌লুর মুখটা টিউবলাইটের মতন উজ্বল হয়ে উঠেই দপ্ করে নিভে গেল।

— কার শ্বশুর? আমার তো ব্যাটা এখনো বিয়েই হয়নি।

— আরে ওই যে গো - শ্যামলীদির বাবা! বাজারে ঘুরছিল একটা ইয়াব্বড় ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে। বলল তোমার সাথে নাকি কিসের দরকার আছে।

বড় ইলিশ মাছ? ওরা আসলে পূর্ববঙ্গের লোক তো! তবে সেরম কোন উৎসবও তো নেই কাছেপিঠে। শ্যামলীরও তো জন্মদিন পেরিয়ে গেছে, ওর বোনের জন্মদিন-টন্মদিন হবে বোধহয়, টুব্‌লু নিজের মনে বিড়বিড় করলো।

নেবুকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার বল তো! তোকে কিছু বললো ?

— না, বললো যা বলার তোমাকেই বলবে, তোমার সাথেই কি বিশেষ দরকার আছে যেন!

— ও আচ্ছা, তুই যা এখন আমি পরে সময় মতন দেখা করে নেব।

নেবু বললো, কংগ্রো দাদা, পরে পার্টি চাইই কিন্তু।

মুচকি হেসে নেবুর দিকে তাকিয়ে টুব্‌লু জিজ্ঞেস করল, এই শোন, আমাকে কি খুব বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে?

আড়চোখে টুব্‌লুর দিকে তাকিয়ে যেতে যেতেই নেবু হেসে উত্তর দিল, না না, এক্কেবারে কচি ছোলমন খান দেখাচ্ছে। একদম পারফেক্ট এক নাম্বার ছাপড়ি।

আবারও টুব্‌লুর মুখটা টিউবলাইটের মতন জ্বলতে গিয়েও নিভে গেল।

সত্যি তো! নেবু কথাটা বিশেষ খারাপ বলেনি। ক্লাবের আয়নায় নিজেকে দেখল টুব্‌লু।

কানের একপাশের চুল একদম উঁচু করে কামানো, সেইদিকের চুল প্রায় নেই বললেই চলে। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে, যে পাশে চুল আছ, সেই চুলটাকে টেনে হিঁচড়ে অপর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চুলটাকে কয়েকদিন আগেই সাদা করিয়েছে টুব্‌লু, চট করে দেখলে একটা সাদা বেড়ালের লোমশ লেজের মতন লাগে। তার সাথে ম্যাচিং করে অন্যদিকের কানে সিলভারের দুল আর গলায় মোটা স্টেইনলেস স্টিলের চেন। এসব করতে অবশ্য বেশ মোটা রকম খরচা সে করেছে । কিন্তু কি আর করা যাবে! 'ভাইরাল ইনফ্লুয়েন্সার'দের এরম করতেই হয়।

নেবু চলে যেতেই টুব্‌লুর মাথাটা এবার টিউবলাইটের মতন জ্বলে উঠলো। অনেকগুলো কাজ বাকি আছে। প্রথমে পার্লার যেতে হবে। সেইমতো, ক্লাবঘরে তালা ঝুলিয়ে রতনের পার্লারের উদ্দেশ্যে হাঁটা লাগাল।

রতন তখন সবেমাত্র ঝাঁপ বন্ধ করে পার্লারের শাটারটা টানব টানব করছে, টুব্‌লু এসে হাজির হলো। এরম শাঁসালো খদ্দেরকে ছাড়া বোকামি হবে, তাই রতন আবার পার্লার খুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল,

— কি ব্যাপার! আজ নায়ক এই অসময়ে এসে হাজির হলো?

— চুলগুলো ভালো করে ছেঁটে একটু কালোও করে দাও আর একটা পুরো ক্লিন শেভড লুক দিয়ে দাও তো !

— কোন স্যাড ভিডিও শুট টুট আছে নাকি? এখন মার্কেটে এসব খুব চলছে, রতন এর চোখে কৌতূহলের চিহ্ন।

— আরে না না । সেসব পরে বলব, তুমি তাড়াতাড়ি কাজটা সারো, বলার পর টুব্‌লুর মনে মনে হিসেব কষে নিল । এবার বাড়ী গিয়ে

একটা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় বাছতে হবে। উফ কি যে আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে পেটের ভেতর একটা প্রজাপতি খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আর এখানে ওখানে আনন্দ ছড়াচ্ছে। কাজ শেষ হবার পর আয়নায় নিজেকে দেখে চিনতে একটু অসুবিধেই হল টুব্লুর। খুশিতে ডগমগ হয়ে টুব্লু রতনকে পঁচিশটা টাকা বেশীও দিয়ে ফেললো।

সারা দুপুর তৈরি হয়ে, বিকেলের দিকে শ্যামলীদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল টুব্লু। পেটের ভেতরটা কেমন যেন গুড়গুড় করছে। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর সময় যেমন হয়, কত মার্ক্স আসে তার চাপা টেনশন! গেটের বাইরে নেমপ্লেটে নাম লেখা শ্রী চুনী শিকদার, শ্যামলীর বাবার নাম। ভদ্রলোক টুব্লুদের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছেলেদের মধ্যে চুশি স্যার বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন। থামের আড়াল থেকে যে কতবার 'এই চুশি' বলে ডেকেছে টুব্লু। তবে যেদিন থেকে জানতে পেরেছে এটা শ্যামলীর বাবা, তবে থেকে একদম যাকে বলে পুরোই বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকী তার সামনে কেউ চুশি স্যার বললে, তাকে সাবধান করে দিতেও ছাড়ে না। যতই হোক ভাবী শ্বশুরমশাই বলে কথা!

এসব ভাবতে ভাবতে টুব্লু কখন যে কলিং বেল টিপে দিয়েছে, শ্যামলীর বোন এসে দরজা খুলল। হলঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, — বসুন বাবা আসছে।

এই মেয়েটার নাম যেন কি ছিল! অনেক চেষ্টা করেও টুব্লু মনে করতে পারলো না। আসলে চুশি স্যার, মেয়েদের নামকরণে চূড়ান্ত ব্যর্থ, নাহলে কেউ অমন ধপধপে ফর্সা মেয়ের নাম শ্যামলী রাখে? শ্যামলী নাম হওয়া উচিৎ ছিল এই মেয়েটির। শ্যামলীর নাম হতে হত ধবলী। দুই বোন, ধবলী আর শ্যামলী, ভেবেই হাসি পেয়ে গেল টুব্লুর! এমন সময় খসখস করে চপ্পল ঘসতে ঘসতে চুশি স্যার উদয় হলেন। পরনে লুঙ্গি আর একটা ফতুয়া। শ্যামলীর বোনটি কখন যে চা দিয়ে চলে গেছে, টুব্লু তা আগে খেয়াল করেনি। কাপটা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই টুব্লুর মনে হল, ইশস আগে প্রণামটা সেরে নিতে হত। চুশি স্যার যে কি ভাববেন তার সম্বন্ধে, যে ছেলেটা কি বেয়াদব, সহবত জানে না!

উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলে, চুশি স্যার বুঝতে পেরে হাতের ইশারায় বসতে বললেন। পাশের ঘর থেকে খিলখিল করে হাসির আওয়াজ আসছে। দুই বোনে মিলে বোধহয় কোন একটা ভিডিও দেখছে মোবাইলে, আর নিজেদের মধ্যে কিসব আলোচনা করছে। ওরা টুব্লুর চ্যানেল দেখছে না তো? কি জানি এতো দূর বলে আওয়াজও তো অস্পষ্ট আসছে। চায়ে দ্বিতীয় চুমুকটা দিতে যাবে টুব্লু এমন সময় চুশি স্যার এমন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন যে ঢোঁক করে বেশি চা মুখে চলে গিয়ে টুব্লুর জিভটাই পুড়িয়ে দিলো। পুরো ইলিশ মাছের টেস্টটাই নষ্ট হবে আজ !

— কি হে টুব্লু? কেমন আছ? চলছে সব ঠিকঠাক? কি করছ যেন এখন?

শুরু হয়ে গেছে ইন্টারভিউ। টুব্লু জানে প্রথম বল থেকেই ছক্কা হাঁকাতে হবে। একদম টি২০ এর মতো।

— আজ্ঞে স্যার, আমি অনলাইনে ভিডিও বানাই, লোকজন দেখে, পছন্দ করে।

— হুম কন্টেন্ট ক্রিয়েটার। শ্যামলী আমায় বুঝিয়েছে কাল।

"শ্যামলী বুঝিয়েছে" এই শব্দগুচ্ছ যেন টুব্লুর কানে মধু ঢেলে দিল। সেই সঙ্গে টুব্লুর আত্মবিশ্বাসও যেন এভারেস্টের চুড়ায়!

— কি যেন নাম তোমার চ্যানেলের? ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ কি একটা!

— "ভাইরাল ইনফ্লুয়েন্সার" স্যার, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে টেনে এনে উত্তর দিল টুব্লু।

— স্যার এটা একটা ভালো জব অপশন ফর প্যাশনেট পিপল্ লাইক মি। আবার রোজগারও বেশ ভালোই হয়!

এটুকু বলেই টুব্লু বুঝলো সে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে ফেলেছে। একই বাক্যের মধ্যে রোজগার আর ইংলিশের সংমিশ্রনে কিছু একটা তুলকালাম বাঁধিয়ে দিয়েছে।

চুশি স্যার অনেকক্ষন চুপ করে বসে থাকলেন । টুব্লু জানে যে, সে স্যারের বলকে পুরো গ্যালারীতে ফেলে দিয়েছে। এবার স্যার রণে ভঙ্গ দেবেন আর বোলিং করতে আসবে তাঁর মেয়েরা। হল ও তাই । চুশি স্যার হেঁকে বললেন, এই শ্যামলী টুব্লুকে ঘরগুলো একটু দেখিয়ে দে।

কিন্তু যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, সে হচ্ছে শ্যামলীর সেই বোন। এসে টুব্লুকে বলল, আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। অগত্যা বেজার মুখে টুব্লুকে উঠতে হলো।

— এই যে এপাশে দেখছেন, এটা আমাদের শোবার ঘর। নতুন রঙ করিয়েছে বাবা। দুই বোনের দুটো ঘর, আর বাবার ঘরটা হলঘর পেরিয়ে উল্টোদিকে, শ্যামলীর বোন বলে চলেছে।

— এই যে এই কোনায় রান্নাঘর, সাবধানে আসবেন, সিঁড়ির কোনা মাথায় যেন না লাগে, একটু দেখবেন।

— তোমার দিদিকে দেখছি না!

টুব্‌লু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলো।

— দিদির আজকে খুব ধকল গেছে, সিঁড়ির ঘরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

রান্নাঘরের ভেজানো দরজা ফাঁক করতেই যা ইলিশ ভাপার গন্ধ এলো, টুব্‌লু মনে মনে বলল, যে এতো ভালো রাঁধতে পারে, সে একটু কেন, সারাদিন সিঁড়ির ঘরে বিশ্রাম নিতেই পারে, এতে কারোরই কোন অভিযোগ থাকা উচিৎ নয়। টুব্‌লু তার কল্পনায় পরবর্তী দৃশ্য কি হতে পারে তার একটা আন্দাজ করে ফেলল। গরম গরম ভাতে অল্প ডিমওয়ালা ইলিশ মাছের পেটি তার ওপরে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সাজানো। শ্যামলী চামচে করে ইলিশ ভাজার তেল ঢেলে দিচ্ছে টুব্‌লুর পাতে, টুব্‌লু চোখেমুখে প্রবল অনিচ্ছার স্বাক্ষর নিয়ে সৌজন্যবোধক "আর না, আর না" করছে আর হাত নাড়ছে। এইসময় কি বলা উচিৎ তার একটা স্ক্রিপ্টও মনে মনে রেডি করে ফেলল।

প্রথম গ্রাস মুখে নিয়েই 'ওয়াও! দারুণ! এসব বলবে । তারপর যেমন সফ্ট তেমন নরম, কালার দেখেই খেতে ইচ্ছে করবে। আচ্ছা ফ্যান্টাসটিক কি বলবে? ওটা খুব কমন শব্দ, সবাই ব্যবহার করে। সে বলবে স্প্লেনডিড্। ডিশ বলবে না – বলবে প্রিপারেশন। আরও পাঞ্জেন্ট মাস্টার্ড, ইয়েলো গ্রেভি এসব বলবে, তাহলে চুশি স্যার খুশি হবেন।

— চলুন, তাহলে কি বলতে হবে বুঝে নিয়েছেন তো? এবার বাকিটা বাবা বুঝিয়ে দেবেন। শ্যামলীর বোনের কথায় টুব্‌লুর সম্বিৎ ফিরল। এবার হলঘরে পৌঁছে দেখল চুশি স্যার ভুঁড়ির ওপর একটা হজমী গুলির শিশি নিয়ে বসে আছে।

— এস এস, টুব্‌লু । তা সব দেখা কমপ্লিট হলো?

— সিঁড়ির ওপর যাইনি স্যার!

— ওপরে দেখার কিছু নেই সেরকম। দোতলা করার প্ল্যান ছিল আমার, রিটায়ারমেন্টের পরে। মানে ওই দুই মেয়ের জন্য দুই তলা আর কী, তা আর হোল না, পিলার গাঁথা অবস্থায়ই রয়ে গেল। শ্যামলীটারও লেখাপড়া কমপ্লিট হোল, জানো নিশ্চয়ই। এম বি এ করেছে, বেশ ভালো একটা এম এন সি থেকে অফারও আছে হাতে। এবার ওর একটা ভালো ব্যবস্থা আমায় করে দিতে হবে। তাই তোমায় বলছি । ছোট থেকেই তো তুমি শ্যামলীকে চেন। সেই একবার আমার হাতে খুব মার খেয়েছিলে মনে আছে? তখন কোন ক্লাস হবে তোমার?

— স্যার ক্লাস থ্রী।

— হুম....। অনেক ছোটবেলার কথা! আসলে ওই বয়সটায় কেউ পাঁচিল টপকে এসে আমার বড় মেয়েকে একটা লাল গোলাপ ধরিয়ে যাবে, আর আমি বসে বসে মজা দেখবো! এটা তো বাবা হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না! কি বল?

— স্যার ওইদিন ভ্যালেন্টাইনস ডে ছিল, দেখুন কালক্রমে আজকেও সেই দিন, চোদ্দই ফেব্রুয়ারি। আর আপনি ধরিয়ে না দিলে ব্যাপারটা আমার মনেও ছিল না স্যার!

— ওইসব ছোটোখাটো ব্যাপার মনে রেখো না। মনে রাখলেই মনের বোঝা বেড়ে যায়! তা যা বলছিলাম, শ্যামলী বলেছিলো কিসব ওয়েবসাইট আছে, আমার আবার ওইসব সাইট-টাইটে একটু আপত্তি ছিল। ওকে জানাতে তারপরে ওই তোমার নাম সাজেস্ট করলো। পরে জানলাম তুমি এতো পপুলার, এতো অনুগামী তোমার, তাই রাজিও হয়ে গেলাম। আসলে যা দিনকাল পড়েছে, ভালোবাসা পাওয়াই মুশকিল, যাও বা দু চারটে চোখে পড়ে সব আগেভাগেই বিক্রি হয়ে যায়। এবার অনেক খুঁজে একটা পেয়েছি।

এতটা শুনে টুব্‌লুর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভালোবাসা বিক্রি আবার কি? চুশিস্যার কি টুব্‌লুকে কিনতে চাইছে? এরম হলে কিন্তু একদম রাজি হবে না, ভদ্রলোকের ছেলে, একটা মান সম্মান বলে বস্তু আছে তো নাকি! এদিকে চুশিস্যার বকেই চলেছেন,

— পুরনোটার একটা হিল্লে না হলে তো আর নতুনটাকে নিতে পারছি না। সেজন্যই তোমায় বলা। তুমি একটু ব্যবস্থা করে দিলে চিরঋণী থাকবো তোমার কাছে।

এঃ, স্যার বোধহয় আনন্দে পাগল হয়ে গেছে কিসব উল্টোপাল্টা বকছে! নাকি এরমধ্যে কোন যোগসূত্র আছে? টুব্‌লু মনে মনে ঘটনাগুলো মেলাতে থাকলো। অতি আনন্দে বশে সে কি কোন পয়েন্ট মিস করে গেছে?

এমনসময় হটাৎ শ্যামলী সিঁড়ির ওপর থেকে বলে উঠলো,

— আচ্ছা ওখান থেকে করলে কেমন হয়? যেখানে বসে আছো ওখান থেকেই ভিডিও শুরু করে দাও। নিচের বাকি ঘরগুলোতো দেখেই নিয়েছ। প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার এই ঘরটা কভার করবে, বলবে বড় রাস্তার দিকে ব্যালকনিওয়ালা রুম, তোমার ভিডিওর প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে এটা। তারপর ইচ্ছে হলে ছাদে চলে গিয়ে আসেপাশের পরিবেশটা দেখিয়ে নিলে, শেষে একতলার ঘরগুলো বলে দিলে, তাহলে বেশি লম্বাও হোল না, আবার দারুণ ইন্টারেস্টিংও হোল।

সব শুনে টুব্‌লু পাথরের মূর্তির মতন খানিকক্ষণ বসে রইল-নট্ নড়ন নট্ চড়ন । কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, ভেবেও কূলকিনারা করতে পারলো না । আস্তে আস্তে যখন সব কিছু জট খুলতে লাগলো, তখন যন্ত্রচালিত রোবটের মতো টুব্‌লু পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে রেকর্ডিং শুরু করলো ওর চ্যানেলে।

— হ্যালো গাইজ, আজ চলে এসেছি একটা সুন্দর বাড়ী দেখাতে একটা দারুণ লোকেশানে। বাড়ীর মালিকের দুই মেয়ে। অন্য জায়গায় এনারা শিফট করবেন...বলতে বলতে টুব্‌লু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। টুব্‌লু এক ধাপ উঠছে, তো অন্যদিক থেকে শ্যামলী একধাপ সিঁড়িতে নামছে, যেন এক হিন্দি সিনেমার বিয়োগান্ত দৃশ্য! টুব্‌লু অনেক কষ্ট চেপে সিঁড়ির ঘরটার ভিডিও নিল। নিচে যেতে একদম ইচ্ছে হচ্ছে না, এর চেয়ে ছাদে যাওয়াই ভালো। ছাদের সিঁড়িতে যেতে যেতে টুব্‌লু রেকর্ডিং চালিয়ে যেতে থাকলো,

আবছা আলোয় তাকে ঠিক চিনতে পারলো টুব্‌লু

— এই যে আপনারা দেখছেন, একতলা তৈরি করেই মালিকের পয়সা শেষ হয়ে গেছিলো তাই দোতলার দুটো পিলার তুলেই রেখে দিয়েছে, প্লাস্টারের কাজও বাকি রেখেছে। ছাদের এক কোনায় শিশি-বোতল জড়ো করে রেখেছে, এগুলো ফেলারও টাইম পায়নি। কয়েকটা আবার বিয়ারের বোতলও রয়েছে। বুঝতেই পারছেন কতোটা অলস এরা !

আর থাকতে পারল না টুব্‌লু, এবার রেকর্ডিং বন্ধ করে ছাদের এককোনায় বসে পড়ল। এরম কেন হল তার সাথে? কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ থেকে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলো,

— চুশি স্যার এরম ভাবে সুবিধে নিয়ে নিলো আমার থেকে! জানত না কি? বোঝে নি কি কোনোদিন আমার ব্যাপারটা? এবার নেবুকে গিয়ে আমি কি মুখ দেখাবো? বাসা? বাসা তো পাখিদের হয়, চড়ুইয়ের হয়, বাবুই পাখির হয়। মানুষের হয় বাড়ী ...বসতবাড়ী ...বাপের বাড়ী ...শ্বশুরবাড়ী ...বয়ে আকারে বা ...আর বলতে পারলো না। ছাদে আড়াল থেকে কেউ বোধহয় শুনছিল, বোধহয় নেমে গেল, কিংবা কি জানি হয়তো মনের ভুলও হতে পারে।

তারপর খানিক বাদে ছাদ থেকে নেমে, কোনক্রমে কিছু রুমের ফটো আর টুকরো টাকরা কয়েকটা ভিডিও নিয়ে টুব্‌লু কাজটা দ্রুত শেষ করলো। চুশি স্যার একটা জালকাটা স্যান্ডো গেঞ্জি পড়ে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এলেন। শ্যামলী বা তার বোনের আর কোন পাত্তাই নেই। একবুক হতাশা নিয়ে টুব্‌লু বেরিয়ে এলো চুশি স্যারের বাড়ী থেকে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সেই কখন এক কাপ চা খেয়েছে। একটু এগিয়ে মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান আছে। ওদিকেই যাওয়া যাক। কিন্তু এরপর যা ঘটলো, তার জন্য টুব্‌লু একটুও প্রস্তুত ছিল না। হটাৎই একটা মেয়ে দৌড়ে এসে টুব্‌লুর হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেটে কিছু একটা জিনিস ধরিয়ে দিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যদিন হলে টুব্‌লু খুব হাঁক ডাক পাড়ত, কি হচ্ছে কি? কে আপনি? এসব বলে চিৎকার জুড়ে দিত। কিন্তু আজ বেজায় মনখারাপ আর খানিকটা অন্যমনস্ক থাকার দরুন এসব মাথায় আসেনি। পলিথিনটা খুলতেই একটা স্টিলের ঢাকনা দেওয়া টিফিন কৌটো বেরোল। ঢাকা খুলতেই সেই ইলিশের মন মাতানো গন্ধটা এসে নাকে ধক্ করে ধাক্কা মারলো। প্যাকেটের ভেতর আরেকটাও কিছু একটা রয়েছে। টুব্‌লু হাত দিয়ে খুঁজে বের করলো সেটাকে, একটা লাল গোলাপ! দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি এবার ঘুরে টুব্‌লুর দিকে তাকাল, আবছা আলোয় শ্যামলীর বোনটিকে চিনে ফেলতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। রাস্তার হ্যালোজেনের ম্লান হলুদ আলোর ছটায় তাকে কোন মায়াবী রাজকন্যা বলেই টুব্‌লুর মনে হল।

কল্পনার বন্দীশালায়

অঙ্কন : Disha Costa

স্বপ্নের সজীব ধারা

অঙ্কন : পৌলমী জানা

বিশ্ব নাগরিক

পাপিয়া দাস

নগর হতে নগরে ফিরেছি
আমি যে নাগরিক ।
সেই কোন আদিম কাল হতে পথ চলা শুরু
আমার পূর্বপুরুষের হাত ধরে ।

কত নগর-প্রান্তর-কাঁটাতার পেরিয়ে
থেমেছি কোথাও,
গড়েছি বসতি, দু-এক প্রজন্মের ।
খানিক থেমে, আবারো পথ চলা শুরু
আগামী প্রজন্মকে উন্নত কোনো
দিগন্ত খুলে দেওয়ার খোঁজে।
কাঁটাতার বদলে, রঙিন পরিচয় পত্র হাতে
অন্য বায়ু, অন্য ভাষা
সম্পূর্ণ অন্য এক আঙ্গিকে
নিজেকে নিয়ে মেশা ।

হয়তো দু-এক প্রজন্ম বাদে
শুরু হবে আবারও পথ চলা
আবারও হয়তো
অন্য কোনো দেশ-কালেদের গণ্ডি পেরিয়ে
উন্নততর সুখের সন্ধানে বয়ে চলা ।

সৃষ্টি আদি হতে অন্ত
না জানি কতবার
কত প্রজন্ম হতে প্রজন্ম
হিন্দু-বৌদ্ধ কিংবা ইসলাম-খ্রীষ্ট রূপে
পৃথিবীর জুড়ে প্রদক্ষিণরত ,
আমি সেই নাগরিক ।

কথা

দেবযানী গুহ বসু

কথা জমেছে অনেক জমতে জমতে পাহাড়
পাহাড়ের গায়ে রোদ নামে কথারা শুকোয়
পুড়ে ছারখার হয় তবু নূতন কথা জমে
ঝড় আসে কিছু কথা বাতাসে ওড়ে
অন্যের গায়ে পড়ে মেঘ কখনও আগুন
শান্তি নেই কোথাও কথারা বারবার জমে
একদিন মেঘ ঢাকে পাহাড়কে অন্ধকারে
কথারা ভয় পায় একে একে মরে সব
শবে কথা জমেনা গুমরে মরে আঁধারে
শান্তি নেই তবু শব ঘিরে কথারা নাচে।।

I am Mr.husband and you are my darling

I was appointed as a photographer for a German wedding. At the time of photoshoot I asked them to move at the certain place for a candid photo and while bridesmaid was missing or she was somewhere else and this newly wed husband wife were moving towards the place which I asked for, casually husband understood that dress will mess up and he provided his helping hand without waiting for someones assistance and it was like the natural feeling that cross my mind which was telling me a feeling that I will be always there for you. Without them noticing I took these photos from behind and whenever I see this photo I see a very strong emotion and bonding between two people could have.

-- Parag Desai

বাটা কাহিনী

শুভ্রদীপ মন্ডল

So many people die in bed because they stop moving. If you stop, you're dead. If you slow down, you're half-dead. Life is movement. - Tomáš Bata

শুরুতেই যে শহরের কথা বলতে বসেছি তার গল্প আপাতত ঘরের কোণে পরে থাকা এক বহু পুরোনো জুতোর বাক্সতে বন্দী। সেই বাক্সের নাম "বাটা"। যার নতুন জুতো ছোটবেলায় পুজোর আনন্দটা বহুগুন বাড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, তার চাহিদা সময়ের সাথে সাথে আজ বেশ অনেকটাই কম।

গল্পের শুরুটা হচ্ছে এক সুন্দর সোনালি বিকেলে সুইটজারল্যান্ডের এক ছোট্ট শহরে ঘুরতে ঘুরতে; সালটা ২০১৯। হঠাৎ চোখে পড়ল বড় একটি বাটার অফিস। স্বভাবতই, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বাটানগরের অজানা ইতিহাসে নিজেকে গুলিয়ে ফেলে, সুইটজারল্যান্ডের এই অফিসটি দেখে ছোটবেলার নস্টালজিয়াটা ফিরে আসছিল। ঠিক তখনই এক বন্ধুর কথায় ভুলটা ভাঙল। জানতে পারলাম, বাটার জন্ম বাটানগরে নয়, চেক্ রিপাবলিকের কোনো এক ছোট্ট শহরে।

তারপর কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে, বাটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার বিশেষ প্রয়োজন বা অবকাশ কোনটাই হয়নি। কিন্তু হটাৎ ২০২৩ সালে এক প্রজেক্ট মিটিং এ যাওয়ার সুযোগ হলো চেক্ রিপাবলিকেরই এক ছোট্ট শহর Zlin-এ। যে ইউনিভার্সিটি তে যাওয়ার কথা হচ্ছিলো, তার নাম টমাস বাটা ইউনিভার্সিটি। আবার বাটা!! নস্টালজিয়া আর সুইটজারল্যান্ডের সেই অসম্পূর্ণ কথোপকথনের পথ খুঁজতে গিয়ে যা জানতে পারলাম তা অনেকটা এইরকম-

১৮৯৪ সালে তিন ভাইবোন টমাস বাটা, অ্যান্তোনিন বাটা আর আনা মিলে প্রথম গড়ে তোলেন "টি এন্ড এ সু কোম্পানি" Zlin শহরে। যদিও এই কোম্পানি নতুন ছিল তবুও বিগত আট প্রজন্ম ধরে এই পরিবার জুতোর ব্যবসার সাথেই যুক্ত ছিল যা ছিল এই কোম্পানির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। সাল ১৯১৪, শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। চারিদিকে যখন ধ্বংস, আর হাহাকার ঠিক তখনই বাটা কোম্পানির কাছে সুযোগ এলো মিলিটারি জুতো তৈরী করার। আরেকটি নতুন সেক্টর খুলে গেলো এই কোম্পানির জন্য। চেকোস্লোভাকিয়ার বাইরেও ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, যুগোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, এমনকি ইউনাইটেড কিংডম, আমেরিকা, ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ করলো বাটা কোম্পানি। ১৯৩০ সাল এর মধ্যে বাটা হয়ে উঠলো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জুতো রপ্তানিকারক।

"Bata's Lift", বিল্ডিং নম্বর ২১

কোম্পানি বড়ো হয়ে উঠছিলো কিন্তু তার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য খুব বেশি সময় বাকি ছিল না টমাস বাটার কাছে। সেদিন ছিল

কুয়াশাঘন এক গ্রীষ্মের সকাল — সাল ১৯৩২। টমাস বাটা উঠে বসলেন তার ২ সিটার Junker J ১৩ এ। উদ্দেশ্য সুইটজারল্যান্ডের Möhlin শহর এ ৫৯ একর এর নতুন বাটার কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কুয়াশার জন্য এমনিই ২ ঘন্টা দেরি হয়ে গিয়েছে। তাঁর পাইলট তাঁকে অনুরোধ করলেন আর কিছুক্ষন অপেক্ষা করার জন্য। কিন্তু পুত্র টমাস জে. বাটা যে অপেক্ষা করছেন Möhlin শহরে তাঁরই জন্য। তাই আর অপেক্ষা করলেন না টমাস বাটা। কিন্তু টেক অফ এর কিচ্ছুক্ষণের মধ্যেই ক্র্যাশ করলো তার Junker আর তখন প্রাণ হারালেন তিনি আর তাঁর পাইলট। এর দুদিন পর Zlin শহরে তার শবযাত্রায় হাজির হয়েছিল প্রায় ১৫০,০০০ মানুষ। বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর শেষদিনে এতো মানুষের সমাগম এমনি এমনিই ঘটেনি। টমাস বাটা এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি তাঁর কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানই করেননি, তিনি তাদের বেঁচে থাকার আর নিজের জীবন গড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। নিজেদের মূল জুতোর ব্যবসা ছাড়াও সেই সময় Zlin শহরে গড়ে উঠেছিল বাটা ট্যানারি, বাটা ইঞ্জিনিয়ারিং, বাটা রাবার প্লান্ট, বাটা কেমিক্যাল রিফাইনারি, বাটা পাওয়ার স্টেশন; এমনকি বাটা ফিল্ম ষ্টুডিও। নিজের কর্মীদের জন্য তিনি তৈরী করেছিলেন হাউসিং কমপ্লেক্স আর হাসপাতাল। কর্মীদের নিজস্ব ইন্সুরেন্স, এডুকেশন, অবসর সময়ের এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছুরই ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সেই সময়ের রেলওয়ে লাইনস নিয়ন্ত্রণ করা থেকে Otrokovice এ নিজস্ব এয়ারপোর্ট অব্দি তৈরী করেছিলেন।

Zlinএ বাটার Skyscraper এ দাঁড়িয়ে লাল ইঁটের তৈরী বাড়ি আর দূরের পাহাড় ঘেরা এই শহরের নগরায়ন দেখতে দেখতে ইতিহাসের এই অধ্যায়টার কথা বার বার মনে হচ্ছিলো। এই Skyscraper— যার আরেক নাম বিল্ডিং নম্বর ২১, একসময় ছিল বাটার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং। যখন এটি তৈরী হয় (১৯৩৭-১৯৩৯) সেই সময়ের ইউরোপের তৃতীয় উচ্চতম বিল্ডিং ছিল এটি। এখানেই রয়েছে "Bata's Lift"। জন অ্যান্তোনিন বাটার ইচ্ছে ছিল ফ্যাক্টরিতে 'মোবাইল অফিস' এর ব্যবস্থা করা, যাতে ম্যানেজাররা প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পারেন। এইরকম একটি ইউনিটই বাস্তবায়িত হয়েছিল এই বিল্ডিং ২১ এ। এটি ছিল একটি বিলাসবহুল মোবাইল অফিস, যেখানে গরম জলের ব্যবস্থা, একটি টেলিফোন, এমনকি এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থাও ছিল। এই অফিস এলিভেটরে ১৬ তলা বিল্ডিংয়ের শীর্ষে পৌঁছানোর পথে সামনে সাজানো বাটা জুতোর প্রদর্শনী দেখার অভিজ্ঞতা ছিল বেশ অনন্য।

আজ Skyscraperএ এলেও আমরা আগেরদিন এসে পৌঁছেছিলাম Zlin শহরে। যাত্রার বর্ণনা বেশ ছোট কারণ ড্রেসডেন থেকে Zlin শহর আসা বাড়ির পাশের ধানের শিষের উপর শিশির বিন্দু দেখতে আসার মতোই সহজ, সুন্দর কিন্তু ভ্রমণপ্রিয় মানুষদের কাছে খুব একটা উপভোগ্য নয়। ড্রেসডেন থেকে সকাল ১১ টার ট্রেনে প্রায় দু'ঘন্টার ট্রেন জার্নি করে আমরা পৌঁছেছিলাম প্রাগ-এ। তারপর সেখান থেকে আরেকটি ট্রেন এ Otrokovice। সময় লেগেছিলো প্রায় ৩ ঘন্টা । তারপর সেখান থেকে আরেকটি ট্রেন এ প্রায় ১৫ মিনিট লেগেছিলো Zlin শহর পৌঁছতে।

ফিরে আসছি ইতিহাসে। টমাস বাটার মৃত্যুর পর কোম্পানির কর্ণধার হলেন টমাস বাটার ভাই জন অ্যান্তোনিন বাটা। তিনিই ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতার কাছে "বাটানগর"। আজও বাটনগর জুতো ফ্যাক্টরি বিশ্বের অন্যতম বড় বাটা ফ্যাক্টরি গুলোর মধ্যে একটা। এছাড়াও বাটা নামের আরো যে শহরগুলো এই সময়কালে তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো বিহার এর "বাটাগঞ্জ", ব্রাজিল এর "বাটাতুবা", নেদারল্যান্ডস এর "বাটাডর্প", ফ্রান্স এর "Bataville" , পাকিস্তান এর "বাটাপুর"। দিল্লী তে ২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে "বাটাচৌক" মেট্রো স্টেশনেরও উদ্বোধন হয়।

কিন্তু আবারো সময় পাল্টালো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেভাবে বাটা সাম্রাজ্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ছিল ঠিক তার বিপরীত। শুরুটা কিন্তু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতোই। এবার নিজের সৈনিক দেড় জন্য মিলিটারি বুট প্রয়োজন মুসোলিনির। অর্ডার আসলো বাটা কোম্পানির কাছে। তখন বাটা কোম্পানির কর্ণধার টমাস বাটার পুত্র টমাস জে. বাটা। মুসোলিনিকে বুট দেয়া মানে ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করা যার তিনি ঘোর বিরোধী। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মীদের বোঝালেন যে, তারা বুট মুসোলিনিকে না দিলে অন্য কোনো কোম্পানি অবশ্যই সেই স্থান পূরণ করবে। তাতে আখেরে ক্ষতি হবে তাদের ব্যবসা আর কর্মীদের। শেষ অব্দি তাই বাটা গ্রহণ করলো মুসোলিনির প্রস্তাব। এতো কিছুর পরেও Zlin এর সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি হলো না। ১৯৩৯ সালে ১০০ টিরও বেশি পরিবার নিয়ে টমাস জে. বাটা পাড়ি দিলেন কানাডার অন্টারিও তে আর সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন করে বাটা ফ্যাক্টরি। অন্টারিওর সেই শহর আজও "Batawa" নামে পরিচিত।

যখন কানাডায় নতুন এক বাটা সাম্রাজ্য তৈরী হচ্ছিলো ঠিক সেই সময় Zlin শহর আর চেকোস্লোভাকিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছিলো নাত্সি বাহিনী। ধীরে ধীরে শুরু হলো Zlin এ বাটা সাম্রাজ্য পতনের। এ সময় জন অ্যান্তোনিন বাটা তার পরিবার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। তবে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, তখন জন অ্যান্তোনিন বাটাকে এক্সিস শক্তির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়। ফলস্বরূপ, ১৯৪১ সালে তিনি ব্রাজিলে চলে যান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু আরেকটি ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো Zlin শহর। সেদিন ১৩-ই

অক্টোবর ১৯৪৪। পাঁচটি আমেরিকান যুদ্ধবিমান ধেয়ে এলো Zlin শহরের দিকে। Zlin শহরে মুহুর্মুহু বোমার আঘাতে একের পর এক ধ্বংস হলো বাটা ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স, পাওয়ার প্ল্যান্ট, ফুটবল স্টেডিয়াম সহ প্রায় ৬৮ টি বাড়ি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল Malenovská Street এর কাছে গ্যারেজ ভবনটি যা আজ "টমাস বাটা এভিনিউ" নামে পরিচিত। এই বোমার আঘাতে প্রাণ হারান আর গুরুতর ভাবে আহত হন বহু মানুষ।

Zlin শহর, বাটার Skyscraper থেকে

কিন্তু এ ছিল কেবল ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা। ১৩ অক্টোবরের বিভীষিকাময় স্মৃতি যখন Zlin-বাসীর মনে প্রতিদিন নতুন করে গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিচ্ছিলো, তখন ২০ নভেম্বর সেই ধ্বংসের তাণ্ডব পুনরায় ফিরে এলো—এইবার আরও ভয়াবহ রূপে এবং আরও বৃহত্তর পরিসরে। যদিও আমেরিকার লক্ষ্য সেদিন Zlin ছিল না, ছিল Silesian Blechhammer। কিন্তু সেদিন আকাশে কম দৃশ্যমানতার কারণে শেষ অব্দি বোমাবর্ষণ করা হলো Opava, Brno, Hodonín, Břeclav, Zlín আর Přerov শহরে। এই বোমাবর্ষণ Zlin এ শুরু হয় ১২:৩৫ এ আর শেষ হয় ১২:৩৮ এ। মাত্র ৩ মিনিটের এই হামলায় ব্যবহৃত হয়েছিল প্রায় ১৭৫ টি ফ্র্যাগমেন্টেশন বোমা আর ৫৬ টি টাইমবোম্ব। বহু মানুষের মৃত্যু, বাটা কর্মচারীদের হাউসিং কমপ্লেক্স ধ্বংস এবং বেশিরভাগ কারখানার বিনাশ—এই বিধ্বংসী ঘটনার কারণে, বাটা গ্রুপের উৎপাদন কার্যত বন্ধ হয়ে যায় Zlin শহরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক বছর পর, জন অ্যান্তোনিন বাটাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয় সেই সময়ের চেক সরকার। ১৯৪৭ সালে, তার অনুপস্থিতিতেই তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। চেকোস্লোভাক বাটা গ্রুপ এর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৪৯ সালে Zlin শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো "Gottwaldov"। এই নামকরণ করা হয় চেক এর প্রথম ওয়ার্কিং ক্লাস প্রেসিডেন্ট Klement Gottwald এর সম্মানে। খুব তাড়াতাড়ি এই শহরে "বাটা" নাম একটি ট্যাবুতে পরিণত হলো। জুতো উৎপাদনের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল চার দশকের কমিউনিস্ট সেন্ট্রাল প্ল্যানিং এ তার আর কিছুই বাকি রইলো না।

Zlinর রেলস্টেশনের পথে

এই ছিল আপাতত Zlin শহরের উত্থান পতনের কাহিনী। কিন্তু এই সময়কালে Zlin শহরে না হলেও সারা বিশ্ব জুড়ে বাটা গ্রুপ বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চেক এ কমিউনিস্ট সরকার পতনের পর টমাস জে. বাটা আবার ফিরে আসেন Zlin শহরে। তখন নাট্যকার থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়া Václav Havel তাঁকে Zlin শহরে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বাটা আর স্ত্রী সোনজা কে Zlin এ সেদিন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ।

তারপর কেটে গেছে বহু বছর, আর পিছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন হয়নি বাটা সাম্রাজ্যের। নতুন নতুন জুতো তৈরি করতে করতে বাটা হয়ে উঠেছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পথ চলার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। ১৯৩৬ সালে মূলত ভারতীয় স্কুল স্টুডেন্টদের জন্য তৈরী "বাটা টেনিস" জুতো হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের বিশ্বের সর্বকালের সেরা বিক্রিত জুতো। শুধু জুতোর ব্যবহারেই নয়, সেই সময়কালে বাটার সাথে সারা বিশ্ব সাক্ষী থেকেছে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার। ১৯৮৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ, মেক্সিকোর অফিসিয়াল স্পন্সর ছিল বাটা। ১৩ তম বিশ্বকাপের গর্বিত স্পন্সরদের একজন হিসেবে বাটা সেদিন উপস্থিত ছিল আর্জেন্টিনার অধিনায়ক দিয়েগো ম্যারাডোনার "হ্যান্ড অফ গড" গোলের সাক্ষী হিসেবে। ১৯৮৭ সালের ICC ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপেরও অফিসিয়াল স্পনসর ছিল বাটা। ২০০৪ সালে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বাটাকে পৃথিবীর বৃহত্তম জুতো প্রস্তুতকারক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এই আখ্যান শুধুমাত্র বাটা সাম্রাজ্যের সাফল্যের নয়; এটি সেই পুরোনো শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এক নতুন চোখে শহরকে আবিষ্কার করার গল্প। এই গল্প ছোটবেলার নস্টালজিক জুতোর বাক্সে লুকিয়ে থাকা বহু মানুষের জীবনের উত্থান-পতনের গল্প। এ গল্প, সেই সব মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শেখানো একজন লিডারের জীবনগাঁথা, যার প্রতিটি পদক্ষেপে লেখা রয়েছে সাহস, সংকল্প আর হার না মানার প্রতিশ্রুতি।

তথ্যসূত্র:

1. The Cobbler Who Conquered the World. Works That Work, Rob Cameron
2. World War II and the air raid on Zlín, Zlin Architecture manual
3. "What's In A Name Anyways?": The Case Against Bata Library, Emily Johnston
4. Bata Corporation History. Retrieved from Bata Corporation's official website
5. Tomáš Baťa.Wikipedia
6. Thomas J. Bata.Wikipedia
7. First Czech Investor in India: Bata. Embassy of the Czech Republic in New Delhi
8. Tomáš Baťa Foundation. Reflections and speeches of Tomáš Baťa.

প্রতিটা ঘর নতুন কিছু বলে

তিয়াস সামুই

“ঘরের জন্য মানুষ? না মানুষের জন্য ঘর? প্রতিটা ঘর নতুন কিছু বলে, বলে আমি তো নই পর ||”

ছেলেবেলায় এক বিখ্যাত রঙ কোম্পানির এই বিজ্ঞাপনটা টিভিতে বারবার দেখতাম। দেখে খুব অবাক লাগতো, মনে মনে হাসতাম, ধুস্! এরকম আবার হয় নাকি? ঘরের জন্য মানুষ হতে যাবে কেন রে বাবা! মানুষের জন্যই তো ঘর।

ছোটবেলায় মা বাবার ঘরের এক কোণে বিছানার উপর আমার যে পড়ার জায়গাটা, সেটাই মনে হতো সবচেয়ে প্রিয়। দিনে অন্তত একবার বা বারবার ঘুরেফিরে বিছানার ওই বিশেষ কোনাটায় গিয়ে না বসলে মনে হতো দিনটাই পূরণ হলো না। রেজাল্ট খারাপ হয়ে বাবা মায়ের বকা খাওয়াই হোক বা দারুন আনন্দের একটা ঘটনা ঘটাই হোক সেইখানে বসেই মনের কোনে জাল বুনতাম। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতাম । সন্ধ্যেবেলা যখন বসে বসে পড়ার ফাঁকে একটু ঢুলুনি মতো আসতো, তখন ওই ইতিহাসের বইয়ের পড়া মিশরের পিরামিডের ভেতরে মনে হত আমি পৌঁছে গেছি...ঘুরে ঘুরে দেখছি সবটা...হঠাৎ মা এর ডাকে খেয়াল হত, বসে আছি কিন্তু সেই একই খাটের কোনে।

তারপর যখন আরেকটু বড় হলাম ওই আর কি, ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পড়ি বা কলেজে সবে উঠছি, তখন পেলাম নিজের একটা ব্যক্তিগত ঘর। সেই ঘরে তো একেবারে রাম রাজত্ব, ঘরে বসে মোবাইলে সারারাত খুটুর খুটুর করি বা কলেজের পড়া ফাঁকি দিয়ে ডিটেকটিভ গল্প বা প্রেমের গল্প পড়ি কেউ তা জানতে পারছে না। আহা! তখন সেই ঘরটাই মনে হতো স্বর্গ।

ঘরের ভিতরে ঘর ...তার ভেতরে আমি ...

তারপরে কৈশোর পেরিয়ে এলো যৌবন । বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে পেলাম আমাদের দুজনের একটা ঘর, তাতে দুজনে মিলে কত রঙিন স্বপ্ন দেখলাম নতুন সংসার গড়ে তোলার, সেই ঘর থেকে শুরু হল আর একটা নতুন পথ চলার।

তারপর পড়াশোনার জন্য চলে গেলাম ইসরাইল, সেই জীবনে প্রথম বিদেশে গিয়ে দু-কামরার একটা ছোট্ট ছাত্রাবাসের ঘর। সেখানে নিজেদের মতো করে সংসার সাজিয়ে তোলা, একেবারে ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু দিয়ে সিন্ধু গড়ে তোলা যাকে বলে। তখন মনে হতো এই তো এটাই তো আমাদের ঘর! পরবর্তী তিন বছরের জন্য রইল সেটাই আমাদের ঘর, বাড়ি সবকিছু।

অবশেষে জার্মানিতে এসে আমাদের দু-কামরার ঘরে আমরা দুজন ছাড়াও এলো আর একটা ছোট্ট মানুষ, ছোট ছোট হাত পা আর

মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাদের ঘরটা ভাগ করে নিল সেও, আমাদের সন্তান । তখন মনে হল এতদিন যে ঘর ঘর খেললাম সেই খেলা বোধ হয় এবার শেষ হলো, কারণ এখন যে অনেক দায়িত্ব তাকে বড় করার, সুস্থ স্বাভাবিক আর নিরাপদ একটা জীবন দেওয়ার। এখন ঘর ভর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ওর খেলার সরঞ্জাম, রং পেন্সিল, পুতুলের বাড়ি আরও কত কি!

এখন যেন জীবনের এই সময়ে দাঁড়িয়ে ওই বিজ্ঞাপনটার লাইনগুলো খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। আসলে সত্যিই প্রতিটা ঘর নতুন কিছু বলে, প্রতিটা ঘরের সাথে জুড়ে থাকে নানান রকম স্মৃতি আর রংবেরঙের স্বপ্ন, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় দিনের শেষে এই ঘরেই আছে আমাদের ভালো থাকার চাবিকাঠি।

অভিমানী নীরবতা

অঙ্কন : Disa Costa

আমার ব্রাজিল ভ্রমণ

সায়নী দাস

"আমেরিকা" নামটা শুনলেই কেমন একটা অজানা আকর্ষন কাজ করে। সেই ছোটবেলায় বইতে পড়া আমেরিকা নামের দুই মহাদেশের কত না কাহিনী পড়েছি। পড়েছি বিপ্লবের কথা, পড়েছি মুক্ত চিন্তার কথা, পড়েছি শ্রেণী বৈষম্যর কথা, পড়েছি আমাজন, আন্দিজ, নায়াগ্রার, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কথা; যেন আমার স্বপ্ন মহাদেশ। অবশ্য স্বপ্নের মহাদেশ হওয়ার পেছনে রয়েছে শৈশবকাল থেকে জনমুখে শুনে আসা দুই আমেরিকা সম্পর্কিত নানান অজানা তথ্য, যা একটা শিশুমনে কৌতূহল তৈরী করার জন্য যথেষ্ট।

যাই হোক, আসল ব্যাপার হলো আমি ছোটবেলা থেকেই আমেরিকা নিয়ে ভীষন ভাবে উৎসাহী, তা ছাড়া সমাজ মাধ্যমের প্রভাব অস্বীকার করি কি করে। টিভির প্রোগ্রাম দেখে ভাবতাম কোনোদিন কি এই দেশগুলোতে যাওয়ার সুযোগ হবে? এভাবেই এই স্বপ্নগুলো নিয়ে আসতে আসতে বড় হলাম। মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর বিয়ে করলাম। হাজবেন্ড তখন কর্মসূত্রে ইজরায়েলে থাকে। তাই বরের হাত ধরে আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ হলো ইজরায়েল। কিন্তু মনের মধ্যে সুপ্ত আমেরিকার দেশগুলো ভ্রমণের ইচ্ছা তখনও সযত্নে লালিত পালিত হচ্ছে। আসতে আসতে ইজরায়েল ছাড়াও, দক্ষিণ কোরিয়া, মিশর, অস্ট্রিয়া, জার্মানী এসব দেশ দেখার সুযোগ হলো বরের কাজের সূত্রে।আমি তো এতগুলো দেশে থেকে আর এদিক সেদিক ঘুরে বেশ আনন্দেই আছি। হঠাৎ করেই জার্মানীতে থাকতে থাকতে সুযোগ এসে গেলো দক্ষিণ আমেরিকার একটা দেশ ভ্রমনের। এও এক স্বপ্ন দেশ "ব্রাজিল"। নামটা শুনেই মনে পড়ে গেলো, ছোট বেলার ভেঙ্গাবয়েস এর অতি পরিচিত জনপ্রিয় গান "টু ব্রাজিল"! ও এটা তো বলাই হয়নি বরের বিজ্ঞান সম্মেলন (conference) ছিল ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে, আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে। আমাদের তিন জনের সংসারে, আমাদের মেয়ে খুবই ছোট হওয়ার জন্য বর সংকোচ করছিল এতটা দীর্ঘ ভ্রমণ যাত্রার জন্য, কিন্তু আমি তো নাছোড়বান্দা, হোক দূর "ব্রাজিল" বলে কথা, না গেলে হয়! যদিও জানতাম ছোট বাচ্ছা নিয়ে খুব সমস্যা হবে, সামলানোর ঝক্কি আছে, কিন্তু সেই কবে ইজরায়েলের ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি দেখেছি, ব্রাজিলর আবার সেই নীল সাগরের হাতছানি এড়িয়ে যাই কেমন করে। তো এই সব এটা সেটা চিন্তা করেই, আমরা রেডী হয়ে গেলাম আমাদের ব্রাজিলের রিও- ডে -জেনিরো শহর ভ্রমনের জন্য।

মে মাসের ২ তারিখ, ২০২৪ আমরা রওনা দিলাম ড্রেসডেন শহরের মেইন রেলস্টেশন (Hauptbahnhof) থেকে। আমাদের ICE এক্সপ্রেস ট্রেন ছিল দুপুরবেলা ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার জন্য। আমাদের ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে লুফথানশার (Lufthansha) ডাইরেক্ট ফ্লাইট ছিল রিও -ডি -জেনিরো শহর পর্য্যন্ত রাতের বেলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেই দিন ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বেশ ভালো বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই কারণে বিভিন্ন ট্রেন দেরী করে স্টেশনে ঢুকছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়ার আমাদের কানেক্টিং ট্রেন ক্যান্সেল হয়ে গেছিল, অগত্যা অন্য ট্রেনগুলোর ভরসায় না থেকে ওই বৃষ্টির মধ্যেই স্টেশন কাউন্টারের বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। মোটামুটি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। এরপর লুফথানসার কাউন্টারে গিয়ে সেলফ চেকিং এ ব্যাগেজ ড্রপ করে চলে গেলাম বোর্ডিং এর উদ্দেশ্যে। আমাদের আগে থেকেই অনলাইন বোর্ডিং করা ছিল, আমাদের ফ্লাইট ছিল রাত ১০টার কিছু পরে।

কোনো জার্মান ফ্লাইটে এটাই ছিল আমার প্রথম যাত্রা, তাই একটু বেশি উৎসাহ তো ছিলই। ফ্লাইট এ উঠে খাওয়া দাওয়া করে টুকটাক কাজের মধ্যে দিয়ে রাত কাটতে না কাটতেই ভোরবেলা আমরা পৌঁছে গেলাম বহু প্রতীক্ষিত রিও-ডে-জেনিরো তে।এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশন করে আর ব্যাগেজ সংগ্রহ করে, অবশেষে আমরা রওনা দিলাম হোটেল এর উদ্দেশ্যে। সেইজন্য যখন আমরা আমাদের online বুক করা ক্যাবের খোঁজ করতে যাচ্ছিলাম হাতে রাখা ফোনে ম্যাপ দেখতে দেখতে, তখন এয়ারপোর্টে একজন অফিসার বলে উঠলেন ফোন পকেটে ঢোকাতে। আসলে রিওতে ভীষণ চুরি - ছিনতাই হয়। এই ধরুন হাতে ফোন নিয়ে নরমালি হেঁটে যাচ্ছেন, হঠাৎ কেউ একজন হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলো, এইরকম আর কি ... তাই রিও তে গিয়ে চিন্তা আর ভয় একদম লাগেনি সেটা বললে ভুল হবে। সে যাই হোক, এইভাবেই একটু ভয় পেতে পেতে, রিওর সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেল, ব্যারা প্যালেসে (Barra Palace)। হোটেলে ঢুকেই চোখ তো আমার ছানাবড়া! কি বিশাল হোটেলের লবিটা, “এ তো পুরো ৫ স্টার হোটেল এর সমান”, মন যেন আপনা থেকেই বলে উঠলো। রুম অ্যালোকেট হতেই, আমি রুমে গিয়ে পুরো অবাক। কারণ হোটেলের ৭ তলার রুমের ব্যালকনি থেকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম সামনের নীল দিগন্ত জলরাশির দিকে। কি বিশাল ...এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। আহা, কতদিন বাদে এমন সমুদ্র, আর তার নীল জলরাশির ঢেউ দেখছি। কি অপরূপ তার সৌন্দর্য্য, আর তার সাথে ছিল সেই ভয়াল গর্জন। ব্যালকনি থেকেই দেখা যাচ্ছে, বিচে লোকজনের আনাগোনা, বালি নিয়ে খেলা আর সমুদ্রে স্নান করা। আমাদের এপার্টমেন্টটায় কিচেনও ছিল। তাই প্রতিদিনের ব্রেকফাস্ট, আর কখনো কখনো লাঞ্চ,আর ডিনার রুমেই করে নিচ্ছিলাম।

হাজবেন্ড এসেই তার কনফারেন্সে ব্যস্ত হয় পড়েছিল, তাই আমি আর মেয়েই অতলান্তিক এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশি উপভোগ করেছিলাম। সব থেকে বড় পাওনা ছিল সমুদ্র আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ভোরের আলোয় আকাশ লাল করে সূর্যোদয় আর সন্ধ্যার সূর্যাস্ত দেখা, এই অনুভব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফাঁকা ব্যালকনিতে আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে যেতে ভয় লাগতো। কারণ মেয়ে আমার ভারি চঞ্চল।

ব্রাজিলিয়ান লোকেরা সদা হাস্যময়, খুব ফুর্তিবাজ, আর অথিতি বৎসল। পর্তুগিজ ভাষাতেই লোকজন কথা বলছে বেশি, ইংরেজি নৈব নৈব চ। তাই সাধারন মানুষের সাথে কথা বলা একটু কঠিন। ৩ তারিখ ম্যাডোনা এসেছিলেন রিওতে, কিন্তু রাতে খোলা বিচে প্রচুর জনসমাগম হবে শুনে হোটেল থেকে যেতে মানা করলো।

আমরা এক সপ্তাহ রিওতে ছিলাম। তার মধ্যে শহর ও তার আশেপাশের জায়গা দেখতে বেড়িয়ে ছিলাম তিন দিন। এই তিন দিনে আমরা একে একে চোখ ভরে দেখে নিয়েছিলাম, সুগার লোফ মাউন্টেন, খ্রিস্ট দে রিডিমার, সেলারণ স্টেপস, মারাকানা স্টেডিয়াম, কোপ্যাকাবনা বিচ, কার্নিভাল গ্রাউন্ড, লোকাল মার্কেট, ছোট বড় কিছু লেক, আর কিছু প্রাচীন স্থাপত্য। এর মাঝে কয়েকদিন ধরে তুমুল বৃষ্টির জন্য ব্রাজিলের রিও গ্রান্ডে স্টেট জলমগ্ন হয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই খবর টিভিতে দেখে এক বন্ধু ফোন করে জিজ্ঞাসা করলো আমরা জলমগ্ন কিনা। আমরা জানালাম, না, রিও ডি জেনিরোতে কোনো সমস্যা হয়নি।

ব্যারা প্যালেসের ব্যালকনি থেকে সমুদ্রের দৃশ্য

এই ভাবেই দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলো চোখের পলকে আর চলে এলো আমাদের জার্মানী ফেরার দিন। রিওতে থাকাকালীন আমাদের সব থেকে প্রিয় মুহূর্ত ছিল হোটেলের রুমে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট করা আর তার গর্জন শোনা। সেটা আবার না দেখতে পাওয়ার কষ্ট মনের মধ্যে নিয়েই নির্দিষ্ট দিনে (১১ই মে) আবার রওনা দিলাম ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশ্যে। রিও এয়ারপোর্ট আসার পথে, কিছু স্মৃতি এবারের মত মোবাইলের ক্যামেরায় তুলে রাখলাম। ফেরার সময় ও আমাদের ফ্লাইট ছিল লুফথানসা airlines এর, বিকাল বেলাতে। পরের দিন, সকাল দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে। তারপর আবার এয়ারপোর্ট থেকে লোকাল ট্রেন ধরে ফ্রাঙ্কফুর্ট মেন স্টেশনে এবং সেখান থেকে ICE ধরে আবার আমাদের প্রিয় ড্রেসডেন শহরে। অবশ্য এটা বলতেই হয়, রিও ডি জেনিরো শহরের পাহাড় আর সমুদ্রের অপার মেলবন্ধন দেখে আমি মুগ্ধ। যদিও দেখা হলো না অনেক কিছুই, সেটা হতে পারে বিতর্কিত সোনার শহর এলডোরাডো, হতে পারে আমাজন আর রেন ফরেস্ট, হতে পারে বনিত (Bonito) বা চাপাদা-ডিয়ামন্তিনা (Chapada-Diamantina), তবুও এবার কিছু তো হলো। আর এসবই আমার স্মৃতিখাতায় চির অক্ষরিত হয়ে রইলো। ফেরার সময় বারবার মনে উচ্চারিত হতে থাকলো কবিগুরুর সেই অমোঘ লাইনগুলো ---

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।"

হারিয়ে গেলাম

পদ্মনাভ সেন

শুধু কিছু দিনের জন্য
দুটো কথা বলার তরে
দুটো গান গাওয়ার আশায়
তোমাদের মাঝে এসেছিলাম !
হয়তো কিছু কান্না ছিল
হয়তো কিছু হাসি
সুখে দুঃখে মিলে মিশে
মাথা উঁচু করে শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম !

বাঁচতে কোথায় দিলি তোরা
থাকতে কোথায় দিলি তোরা
হঠাৎ করে বহু দূরে
ঠেলে ফেলে দিলি তোরা !

তাই আজ হারিয়ে গেলাম !!

হয়তো এক নতুন আলোয়
আসবো আমরা আবার ফিরে
যেদিন সবাই সাহস করে
গড়বে এক নতুন সমাজ
সেই সমাজে সবাই মানুষ
বিচার হয় সবার সমান !

তখন দেখো তোমরা মিলে
থাকবে না আর ভয়ের অন্ধকার
এতো দুঃখ কষ্ট পেয়ে
হারিয়ে যাবে না কেউ আর !

গড়তে সেই নতুন সমাজ
এতটুকুই সাহস রেখো
জানতে চেয়ো সবাই মিলে
কেন আমরা আজ হারিয়ে গেলাম ?

যান্ত্রিক শিক্ষা ও সভ্যতা

পাপিয়া দাস

অসুস্থ আমি,
অসুস্থ আমার এ দেশ।
কোনো এক ভ্রান্ত প্রতিযোগিতায়
ছুটছে সবাই পোটি বাঁধা চোখে
লাগিয়ে নেশার আবেশ।
সকাল হতে রাত, শুধু চাই শুধু চাই
এত থেকেও কিছুই যেন নেই!
অনেক টাকার বিনিময়ে
আমি, একমুঠো সুখ কিনতে চাই।
তাতে খসুক না কেন লজ্জার আবরণ,
কদর্য হোক না চাহিদার বিবরণ।
স্কুলের পরীক্ষায় আমি যে উত্তীর্ণ,
হই না যতই বিবেকের কাছে দীর্ণ।
আমি তো মুখোশধারী ইন্টেলেকচুয়াল
বিছিয়েছি আমি ইলেকট্রনিক্স-দুনিয়ায়
আমার সাম্রাজ্যজাল।
দেখ না তুমি আমিও তো প্রতিবাদী,
রাতের অন্ধকারের নৃশংস ঘটনায়
মোমবাতি হাতে হাঁটি।
সকাল হলেই বেরোতে হবে
আবার কোনো অসুস্থ সুখের খোঁজে,
রাতের অন্ধকারের দুঃখকে
কে আর বেশিদিন মনে রাখে।"

অন্তহীন

চিত্রগ্রহণ : অর্পিতা কুন্ডু

Griechenland - das magische Land

Aranyasom Das

Im warmen September 2023, bin ich mit meiner Familie nach Griechenland auf die Insel Kreta geflogen. Am Flughafen von Heraklion, wo wir landeten, war direkt neben dem Wasser und es war unbeschreibliches Gefühl bei der Landung. Angekommen in der größten Stadt der Insel, haben wir zunächst ein Auto gemietet, damit wir die Insel frei erkunden können. Danach sind wir in unser Hotel gefahren, welches neben Heraklion direkt am Meer liegt. Lustigerweise wird dieses Hotel oft von Piloten und Flugbegleitern/innen gebucht, da es ein relativ preiswertes 4-Sterne Hotel mit Frühstück-Buffet inclusive ist. Am nächsten Tag sind wir mit dem Auto etwa 300 km die Insel entlang zu einem der schönsten Strände der Welt gefahren – Elafonissi Beach. Als wir da ankamen, fühlte es sich wie ein Paradies auf Erden an – kristallblaues Wasser, weicher und teilweise pinker Sand, Lagune-ähnlicher Strand, hinter uns Berge und Hügel mit Aussicht, was einfach unbeschreiblich war. Wir haben dort den ganzen Tag verbracht und sind abends wieder zur Dämmerung mit einer warmen Windbriese ins Hotel gefahren.

Am nächsten Tag sind wir südlich zum Matala-Beach gefahren, wo wir auf dem Weg tausende Olivenbäume gesehen haben. Am Strand angekommen, waren wir baden und entspannen. Das Besondere an diesem Strand ist, dass es zwischen zwei großen Felsen liegt und dort sich die Matala-Höhlen befinden. Diese Höhlen wurden vor über 1000 Jahren bewohnt und das Erstaunliche ist, dass diese Höhlen sich 20 bis 30 Meter über dem Strand/Wasser gebaut und bewohnt wurden. Wichtig zu erwähnen: Das Spektakulärste von Kreta ist der Gegensatz von Bergen und Stränden, die unmittelbar nebeneinander liegen und mit einer mediterranen Vegetation eine unglaubliche Atmosphäre schaffen.

Am nächsten Tag haben wir ein einheimisches Fischerdorf besucht, welches nicht zu sehr von Touristen befüllt war und sind noch an zwei weitere Strände gefahren, um den Urlaub schön abzurunden. Das

Essen in Griechenland ist erste Klasse. In Restaurants gibt es Brot mit Olivenöl, griechischen Salat und zum Nachtisch Creme-Brûlée und Ouzo immer gratis. Das zeigt auch die Gastfreundlichkeit der Griechen. Das Faszinierende dabei ist, dass fast alle Griechen, sogar in abgelegenen Dörfern etwas Englisch sprechen können. Deshalb hatten wir keine Probleme uns zu verständigen, während des Urlaubs. Am letzten Tag auf Kreta haben wir die historische Stadt Heraklion besichtigt, dass sehr viel antike Geschichte von Griechenland beherbergt.

Folglich sind wir am nächsten Tag mit dem Schiff in die Hauptstadt Athen gefahren, wo wir zwei Nächste verbracht haben. Diese Stadt ist voll von zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Kulturorten, die man gesehen haben sollte. Das Night-Life dort ist auch sehr aktiv und das Essen war hervorragend. Im Großen und Ganzen hatte ich mit meiner Familie einen unvergesslichen Urlaub, an dem ich mich heutzutage gerne zurückerinnere.

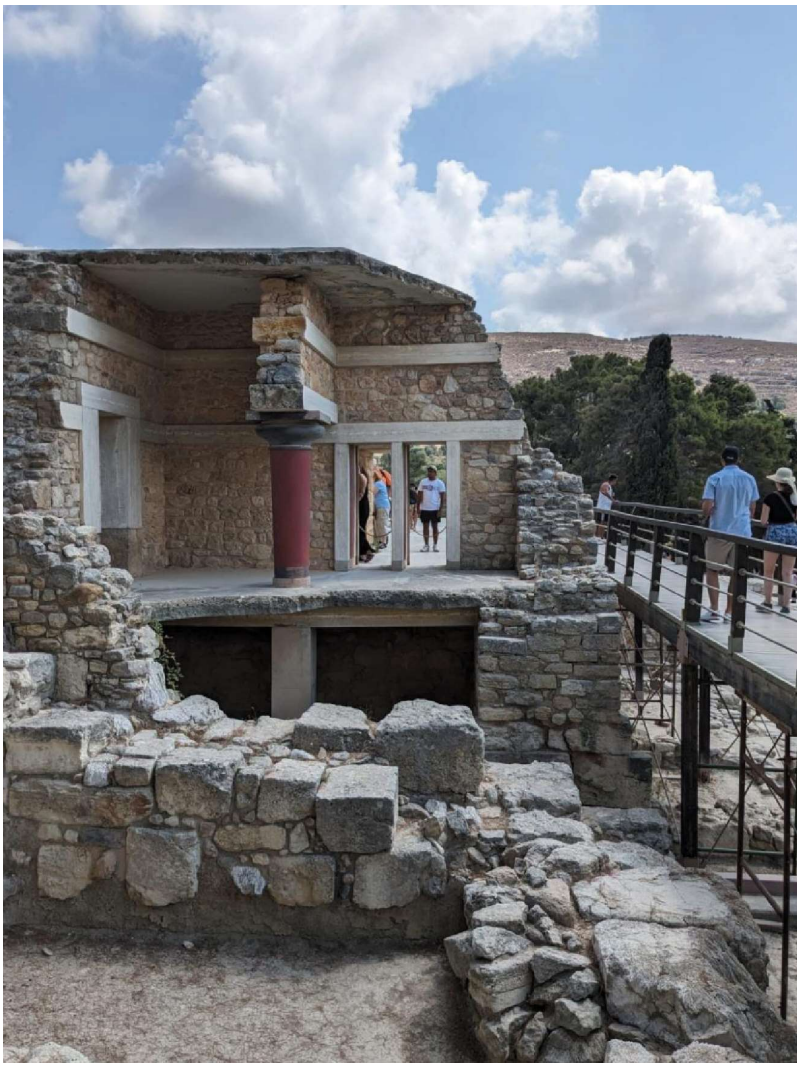

বালির ঘর

কমল সামুই

ইলিশ মাছের আঁশের মত আলো মেখে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো এক দমকা বৃষ্টি এসে লাগলো মুখে চোখে। হোটেলের ব্যালকনি থেকে অনেক খানি চৌকো আকাশ দেখা যায় আর একটু দূরেই উত্তাল সমুদ্র। তার গর্জন বিরামহীন ভাবে কানে আসে। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে তমাল এসেছে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে। কোভিড এর কারণে অনেকদিন ঘুরতে যাওয়া হয়নি। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ব্যাগ পত্র গুছিয়ে লম্বা ছুটি। গন্তব্য কেরালা, সঙ্গে কন্যাকুমারী। কন্যাকুমারী এসে এখানকার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়েছে তমাল; সাগরের ত্রিবেণী সঙ্গম। পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। বিশালত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হয়। বিশাল আকাশ, আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, আর নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা স্বামী বিবেকানন্দ এর পূণ্য স্পর্শ পাওয়া প্রস্তর খন্ড। তমাল দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের কাছেই। তমালের স্ত্রী অঞ্জলী পুত্র বাপ্পা কে নিয়ে গেছে শেষ মুহূর্তের কেনা কাটা করতে। একটা সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দূরে চোখ গেল তমালের। অনেক টুরিষ্ট এর ভিড়ে অনিতার দোহারা দীর্ঘ চেহারার দিকে চোখ না গিয়ে উপায় ছিলনা। একটা নকশা কাটা সুন্দর ব্যাগ নিয়ে জিনিস কিনছিল ও। হঠাৎ করেই অনিতা ফিরে তাকালো আর তমালের সঙ্গে চোখা চোখি হল। সঙ্গে সঙ্গে তমালের সমস্ত শরীরে একটা পুলকের শিহরণ খেলে গেল। একটা অবর্ণনীয় বেদনা মিশে রইলো সেই চমকের সঙ্গে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তমালের হৃদয়ে আছড়ে পড়লো স্মৃতির রেল গাড়িটা; যেটা থমকে ছিল কোন এক অজানা স্টেশনে। আর সেই প্রথম যৌবনের স্মৃতি নিয়ে কেটে গেছে কুড়িটা বছর। এই রকমই এক বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কুড়ি বছর আগে দুই তরুণ তরুণী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের নিবিড় কৃষ্ণচূড়াটার নিচে প্রথমবার এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমবার দেখার পর একদিন তমাল আর অনিতা দুজনে ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনের ঘাসে মোড়া একটা গাছের ছায়া বেছে নিয়ে কিছুটা দূরে দূরে বসেছিল। নিঃশব্দে ঘাসের ডগা দাঁতে কাটতে কাটতে শুধুমাত্র উপস্থিতি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। তাদের এই নিঃশব্দ উপস্থিতি গানের মুগ্ধ রেশের মত ছড়িয়ে পড়ছিল তমাল আর অনিতার মধ্যে। স্নিগ্ধ অনুভূতি রয়ে গেল তাদের মধ্যে।

দুজনে ভিজে বালি নিয়ে একটা বালির ঘর তৈরি করছে বালির উপর বসে

তারপর বিকাল শেষ হতেই তমাল আর অনিতা ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আসলে তারা পরস্পর

তাদের এই পাশাপাশি হাঁটার আনন্দকে উপভোগ করতে চাইছিল। দুজনে বাস স্টপে এসে দাঁড়ালো। কি যেন বলার ছিল - বলতে চাইছিল - কেউই বলতে পারলোনা। দুজনেই নিজেদের নির্দিষ্ট বাস আসতেই উঠে পড়ে আর ভিড়ের মধ্যে পরস্পরের ছিটকে যায়। এর কয়েকদিন পরেই এরকম এক বৃষ্টির দিনে বিনা নোটিশে তমালের বাবা এক হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। বেসরকারি সংস্থার কর্মী ছিলেন তমালের বাবা, মা আর বুড়ি পিসিকে নিয়ে সংসারের হাল ধরতে হল তমালকে। সব স্বপ্নের ছুটি দিয়ে তমাল চাকরি নিয়ে চলে আসে এক মফস্বল শহরে। ইউনিভার্সিটির আর কারোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তারপর জীবন চলেছে নিজের ছন্দে। অঞ্জলীর সাথে বিয়ে, পুত্র বাপ্পা কে নিয়ে নিস্তরঙ্গ জীবন বয়ে চলছিল নিজস্ব নিয়মে। আর এতদিন পরে তমালের নিস্তরঙ্গ জীবনে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত স্মৃতির ঢেউ কুল ছাপিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র নাকি সব কিছুই ফিরিয়ে দেয় - তমালকে ফিরিয়ে দিয়েছে উনিশ/ কুড়ি বয়সের মন। চোখের আড়ালে চলে যাওয়া অনিতাকে খুঁজতে গিয়ে সমুদ্রের বিচে গিয়ে দেখে তার পুত্র বাপ্পা সঙ্গে ওরই বয়সী একটি মেয়ে, দুজনে ভিজে বালি নিয়ে একটা বালির ঘর তৈরি করছে বালির উপর বসে। খুব বড় একটা ঘর, কিন্তু বালির ঘর।

সুরের আল্পনা
অঙ্কন : তপন কুমার চৌধুরী

Lock and Key

Prantik Mahajan

Let me share a small anecdote here. We were just sifting between our keller and apartment trying to shuffle and re-arrange stuff. When we were done and returned to open the main door, to our surprise, the door was not opening with the key. Immediately, our neighbours came to help and tried to call up key makers. But it was difficult to catch hold of them on a Sunday. Fortunately, the big balcony door was open on the other side of the apartment. An idea struck my mind but was difficult to implement without help. Our neighbours immediately came to our rescue. We used a small ladder and then two neighbours, one climbing up on another's shoulder, managed to finally make it up to the big balcony door and get inside to open the main door from inside. We did some structured problem solving and analysis and could figure out the root cause of the problem. The screw of the main door lock had come out due to the unusually high ambient temperature outside. We were finally relieved after being locked out for about a couple of hours.

Moral of the story: Living together in a society and helping each other is a wonderful culture. Understanding the essence of teamwork is critical in life, be it personal or professional. A problem might look big when unresolved but breaking it up into bits and pieces and then solving it through teamwork is extremely effective and satisfying. Salute to the deutsche culture and kudos to the spirit of teamwork and helping each other. After all, a friend in need …is a friend indeed

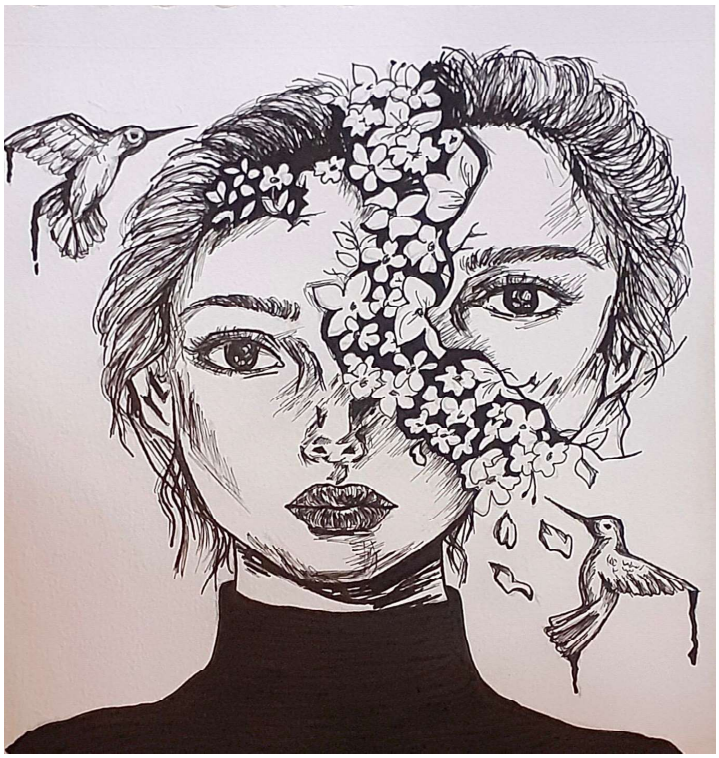

Clash of duality

অঙ্কন : Disha Costa

হলুদের হাতছানি

চিত্রগ্রহণ : শ্রাবন্তী মজুমদার ঘোষ

কনকচূড়ার আত্মকথা

প্রলয় তারণ দাস

লেখকের কথা : আমি বড় কোনো লেখক নই, কোনোদিন ছিলামও না । তবে মাঝে মধ্যে সমাজ মাধ্যমে আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করি খুব নির্দিষ্ট বিষয়ে। সবাই যেমন আজকাল করে থাকে, ঠিক তেমনই। সেই নির্বিবাদী আমাকে নিয়ে বঙ্গোৎসব ড্রেসডেনের পক্ষ থেকে শারদীয়া পত্রিকায় লেখা দেবার জন্য এমনভাবে অনুরোধ করলো, যে সত্যিই এবার আমাকে নিজেকে বড় লেখক বলে মনে হতে শুরু করেছে। তাই ভাবলাম লিখেই ফেলি কিছু একটা, যা থাকে কপালে।

আমি কনকচূড়া। গ্রাম বাংলায় আমাদের এখন তেমন একটা দেখা যায় না। আমাকে আবার অনেকেই রাধাচূড়া বলে ভুল করে। আমাদের ফুল আর পাতা তো একই রকম। আসলে আমি কৃষ্ণচূড়ার আর এক ভাই। রাধাচূড়া আমার থেকে আকার আয়তনে অনেকটাই ছোট। সে আমার বোনের মত। জানিনা বর্তমান লোকজনের কেন এতো অনাগ্রহ আমাকে নিয়ে! শুধু কি আমি? আমার ভাই কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া বা কদম, নিম গাছেদের নিয়েও মানুষের কোনো উৎসাহ নেই; যতটা দেখি ইউক্যালিপটাস, শাল, সেগুনদের নিয়ে। হয়তো তথাকথিত ব্যবসায়িক সাফল্যে আমরা পিছিয়ে আছি তাই। কিন্তু আমরা তো আবহমান কাল ধরে একই জল হাওয়াই বেড়ে উঠেছি। আজ যে গল্প বলছি সে গল্প একান্তই আমার। কিন্তু এই গল্প বাংলার প্রতিটা গ্রামে-গঞ্জে চিরন্তন। আমার গল্পটা শুরু করা যায় অনেক ভাবে, যেমন ক) সময় অনুযায়ী, খ) ঘটনা অনুযায়ী, গ) কোনো একটা স্মরণীয় ঘটনা কে আবর্তিত করে ...অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম সময় অনুযায়ী লেখায় ভালো; যেমন সহজবোধ্য হবে, তেমনি ক্রমান্বয়ে সব কিছু বলা হবে।

সেই কতকাল আগের কথা! ১৯০০ সালের প্রথম দিক মনে হয়। ঠিক মনে নেই কিভাবে আমি জন্মেছিলাম এই পার্বতীপুর গ্রামের এই ছোট্ট জনপদে। যতদূর মনে হয় কোনো এক পাখির ফেলে দেওয়া বীজ থেকেই এই গ্রামের ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের ধারে, গ্রামের বড় রাস্তার পাশে আমার জন্ম। যখনকার কথা বলছি তখন এসব জায়গা তো ফাঁকা মাঠ। এই বড় মাটির রাস্তাটা আশেপাশের দুটো গ্রামের যোগসূত্র রচনা করেছে। শুধুই বনবাঁদাড়ের জঙ্গল, মাঝে মধ্যে কয়েকটা বট, বেল, অশ্বত্থ দেখা যায় বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই ছোট গুল্ম আর ঝোপঝাড়।

তখন এই গ্রাম বাংলায় ব্রিটিশ যুগ চলছে, রাতের বেলা গ্রামের কোনো মানুষই এই দিকটায় আসে না। আর অন্য গ্রামের কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ গ্রামটার এই অঞ্চলে 'ডাকাতে গ্রাম' হিসাবে খ্যাতি আছে যে। আমি ছোট হলেও ডাল পালা একটু মেলে মাথাটা উঁচিয়ে দেখতে পাই রণ-পা এ সেই ডাকাতদের আনাগোনা, ঠগীরা কেমন করে মানুষ মারে। এই তো সেদিনই দেখলাম রাতের অন্ধকারে গ্রামের জমিদারের পেয়াদারা খাজনা দিতে পারেনি বলে এক গরীব চাষীকে কি মারটাই মারল আমার সামনে। তারপর আধমরা করে ফেলে রেখে চলে গেলো আমার পাশের অশ্বত্থদার কোলে; খুব কষ্ট হয় এসব দেখে। সেবার বর্ষায় যখন গ্রামে বান এলো, অনেক মানুষ, যাদের বাড়ি বাউড়ি পাড়ায়, মুচি পাড়ায়, তাদের বাড়ি ভেঙে পড়লো টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে, তারা কোথাও যাওয়ার জায়গা না পেয়ে আমাদের এদিকটায় চলে এসেছিল কিছুটা উঁচু বলে। গ্রামে যাদের বড় বড় বাড়ি, তারা তো উঁচু বংশজাত; তারা আবার এইসব লোকেদের থাকতে দেয় নাকি? হয়তো একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেই এই গরীবগুলো বর্তে যেতো। কিন্তু সেগুড়ে বালি! প্রায় ২ মাস মত থাকলো এরা। চোখের সামনে দেখলাম একদল অভুক্ত মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। দেখে মনে হলো এরাও তো আমাদের মতই, তবে দলবদ্ধ। আমরা যেন বড্ড বেশি একা একা। দলবদ্ধ হতে চাইলেও আমাদের সরিয়ে দেওয়া হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

সে যাই হোক, ওদের প্রতিটা আবেগ, ভালবাসা, আনন্দ দুঃখের নীরব সাক্ষী আমি। তখন আমাদের এই শুনশান জায়গাটার নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হতো বাচ্চাদের চিৎকারে, উঠতি যুবক-যুবতীদের প্রগলভতায়, অন্যদের কর্ম ব্যস্ততায়। ঘুমনোই কষ্টকর। বানের জল নেমে গেল, গ্রামের পাড় বাঁধানো গেল। তারা আবার চলে গেল নতুন ঘর বেঁধে। শুধুই কি তাই? আমাদের এলাকায় যেসব পাখিরা গান শোনাতো, সেই টিয়া, বাবুই, চড়ুই, শালিক, কাকের দলের সদস্যরা কোথায় গিয়ে যে পড়লো আর তাদের কত বাচ্চা যে মারা গেলো তার হিসাবই বা কে রাখে! সেই রাতের এক শালিক দম্পতির কথা আজও মনে পড়ে। ওইসময় ঝড় জলের রাতে তারা তাদের বাচ্চাদের হারিয়ে কতই না কাঁদছিল। আমার এই ছোট্ট হৃদয়কে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে যদি না আমি অব্যক্ত হতাম, যদি না আমি স্থবির হতাম, নিশ্চিত আমি ওই রাতে ওদের বাচ্চাদের খুঁজতে বেড়াতাম।

এইভাবেই দিনগুলো কাটছিল ধীর লয়ে। এই ছোট্ট জনপদের এক প্রান্তে, আমরা ছোটরা সব একসাথেই বড় হচ্ছিলাম আনন্দ উল্লাসে আর বড় দের অনুশাসনে। যখন ফুরফুরে দখিনা হাওয়া দিত তখন সবাই মিলে মৃদুস্বরে গান করতাম এক ছন্দ, এক তালে। সে কি উৎসাহ-উদ্দীপনা সকলের মধ্যে! তবে কালবৈশাখীর সময় সাবধানে থাকতে হতো। সবাই মিলে জোর করে পাতায়-পাতায়, ডালে-ডালে একে

অপরকে আঁকড়ে ধরতাম, যেন কারো ক্ষতি না হয়।

তখন আমার বয়স মনে হয় ১৫-১৬, আর বহরে আসতে আসতে বাড়ছি। পাশের দাদা-দিদিরা পরম স্নেহের পরশ মাঝে মধ্যে বুলিয়ে দিয়ে যায় আমাদের ছোট্ট তনুলয়ে। বলতে সংকোচ করবো না, আমিই আমার রূপ দেখে মুগ্ধ। ধীরে ধীরে আমি ছোট ছোট ডালপালা মেলছি চারিদিকে, কচি কচি সবুজ পাতা দিয়ে খাবার তৈরী করছি। সে এক অন্যরকম ভালো লাগা। এই গ্রামের পশ্চিমপাড়ার "পলাশ" দেখি প্রতিদিন দুপুরে আমার কাছে এসে বসে। ওদের গরু, ছাগলগুলোকে পাশের সবুজ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে চড়তে দিয়ে। কতই বা বয়স ছেলেটার? ১০ কি ১২। প্রতিদিন ও আদুল গায়ে একটা ধুতি পড়ে আসে।মনে হয় এটাই ওর পরণের কাপড়, শতছিন্ন, না কাচার জন্য কালো ছোপ ছোপ হয়ে গেছে । ও এসে কত যে গল্প বলে আমার সাথে ফিসফিসিয়ে, কি যে বলি। বলে গ্রামের কথা, বলে ওর ছোট্ট ভাই-বোনের কথা, বলে জমিদারের অত্যাচারের কথা, বলে জাতিগত বৈষ্যমের কথা। আর বলে ওর সুন্দর সুন্দর স্বপ্নগুলোর কথা । আমার খুব ভালো লাগে শুনতে। মাঝে মাঝে ওর মাথায় আমার সদ্য ফোটা হলদে রঙের ফুল ফেলে, মাথা নাড়িয়ে ওর কথার জবাব দিই। ও হয়তো বোঝে আমিও ওকে কতটা ভালবাসি। আমার কাছে বসেই ও দুপুরের পান্তা খায়।

এই গ্রামের পশ্চিমপাড়ার পলাশ প্রতিদিন দুপুরে কাছে এসে বসে

একদিন গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরে ও আমার ছাওয়া তে ঘুমোচ্ছিল। আমি ওর মাথায় উপর সময় সময় হালকা হাওয়া করছিলাম। সেদিন ওর সাধের গরুটা কি মনে করে আমার কাছে এসে গলা বাড়িয়ে মনের সুখে আমার পাতা চিবুচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল, তখনও তো অতটা বড় হইনি। হঠাৎ দেখি পলাশ জেগে উঠে ওর গরুর এই কান্ডকারখানা দেখে প্রচণ্ড রেগে গরুটার পিঠে এক চাপড় বসিয়ে দূরে নিয়ে গিয়ে খুঁটে বেঁধে দিল। আমার প্রতি ওর এত ভালো লাগার কারণ আমি জানি না, তবে আমিও যেন ওকে ভালবেসে ফেলেছি। আমরা তো পিঠোপিঠি। পরের দিন থেকে আমার গোড়াতে একটা ছোট্ট বেড়া বানিয়ে দিলো কয়েকটা খুঁটি আর শনের দড়ি দিয়ে। সেই দিন থেকে প্রতিদিন বাড়ি ফেরার সময় আমার গোড়াতে জল দিতে লাগলো। একদিন এসে আমাকে বলল "জানো কনকচূড়া, শুনছি এখানে নাকি ইস্কুল হবে, আমাদের গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়বে। গ্রামের জমিদার, আর গ্রামের বামুন পাড়া আর কায়স্থ পাড়ারা উদ্যোগ নিয়েছে। কিসব বলছে ফ্রী ইস্কুল না স্বদেশী বিদ্যালয়। কিসব স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব! আমরা তো মুখ্য সুখ্য মানুষ আমরা আর কি বুঝবো।

এই তোমার সামনের ফাঁকা মাঠটাতেই হবে।" শুনে আমার খুব ভালো লাগলো, যাক আবার সেই কচি কাঁচারা ফিরবে। তারা খেলবে, গাইবে, নাচবে। সত্যিই খুব ভালো একটা ব্যাপার।

এরকম করে ৭-৮ বছর কেটে গেলো। পলাশ আমাকে বলেছে ওদের পাশের পাড়াতে যে কয়েক ঘর বাউরি আছে, সেখানকার চাঁপাকে ওর খুব ভালো লেগেছে। গেলো বার চড়কের মেলায় একটা রঙিন ফিতে দিয়ে আরো ভালো করে ভাব করেছে। পলাশ এখন জোয়ান মরদ, ও বলেছে সামনের অগ্রহায়ন মাসে ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। এই তো সেদিন চাঁপাকে আমার সাথে দেখা করাতে নিয়ে এলো। চাঁপা তার ছোট্ট হাত দিয়ে যখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো কত যে ভালো লাগছিল। পলাশ বলল "কনকচূড়া কে শুধু হাত বোলালো হবে? যা পুকুর থেকে কোঁচলে করে জল এনে দে। আজ তোকে আমার এক পরম বন্ধুর সাথে পরিচয় করালাম। যা নিয়ে আয়।" চাঁপা নিয়ে এলো এক ছুটে। সেই জল পানের গল্প আমি আজও ভুলিনি। পলাশের বিয়ে তো হলো, কিন্তু সেই বিয়ে নিয়েও কি একটা কান্ড। পলাশের খুব ইচ্ছে ছিল বউকে একবার পালকিতে বসাবে। কিন্তু গ্রামের জমিদারের কড়া নির্দেশ গ্রামের মধ্যে কোনো পালকি যাবে না। পলাশ বলল, "রাতে নিয়ে যাবো কেউ তো আর দেখবে না"। সকাল হতেই খবরটা আগুনের হলকার মত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। পলাশের জরিমানা হল আর রইলো ৩০ বার বেত্রাঘাত। ওরা মারল এমনভাবে যে ছেলেটার গা'টা নীল হয়ে গেছিল। আমার কাছেই ওকে ফেলে দিয়ে গেলো।

আসতে আসতে দিন পরিবর্তন হতে শুরু করল। বাতাসে খবর নিয়ে আসে যে স্বদেশীরা আসবে, তারাই নাকি দেশ স্বাধীন করবে। মাঝে মধ্যে রাত্রের দু তিন প্রহরে আমিও যে দেখিনি তা নয়। সবাই তরতাজা যুবক। একবার আমার ছায়াতে শুয়েই তারা আলোচনা করছিলো কোথাকার নাকি কলের গাড়ির রাস্তা তুলে দেবে। আমি বাবা ওইসব গাড়ি দেখিনি কোনোদিন। শুনেছি যেখানে ওইসব গাড়ির রাস্তা হয়, সেখান হাজারে হাজারে আমাদের মত গাছদের কেটে ফেলে দেওয়া হয়। আমাদেরও পুনর্বাসন দিলে ভালো হতো। আমরাও তো এই পৃথিবীর মায়াতে কিছু দিন আরো বাঁচতে পারতাম মাথা উঁচু করে।

যাই হোক, দেখতে দেখতে পলাশের ঘর আলো করে পরপর ছেলে মেয়ে এলো। আর এদিকে ইস্কুল ও স্থাপিত হলো। খড়ের চালার তিন কুঠুরি ঘর। গ্রামের ছেলে-বউরা মিলে সেদিন সব সেজেগুজে এলো। গ্রামের মাতব্বররা বক্তব্য রাখলো একে একে। আমি শুনলাম সবই । খুবই ভালো উদ্যোগ। সেই উপলক্ষ্যে কয়েকটা আম, জাম, বকুল, বেল গাছও লাগানো হলো। বেশ একটা জমজমাট পরিবেশ। আমিও এতদিনে অনেকটাই বড় হয়ে গেছি। প্রায় ৪০-৫০ বছর তো হলো। পলাশ ও বুড়িয়ে গেছে। তবুও ও আসে আমার ছায়াতে কিছুক্ষণ বসে গল্প করে চলে যায়। বলে গেলো ও দাদু হতে চলেছে। সময় যেন পলক ফেলতে না ফেলতে এগিয়ে যায়।

আমার একই রোজনামচা চলছে। মানুষজন দুমুঠো খেতে পাচ্ছে, সারা বছরভর বেশ চাষ-আবাদ হচ্ছে। বেশ সবাই হাসি খুশি। হঠাৎ করে,সেই বছর পার্বতীপুরে কলেরা হলো বর্ষার পরপর। শুনতে পেলাম এই রকম মহামারী অনেককাল কেউ দেখেনি। টপাটপ লোক মরছে। গ্রামের ধনী লোকেরা এক কাপড়ে শহরে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় একদিন শুনলাম পলাশ আর চাঁপাও মারা গেছে, তাও আবার একই দিনে। গ্রামের অন্যদিকে পুলের ধারে একটা বড় গর্ত খুঁড়ে সবাইকে মাটি চাপা দিচ্ছে। পলাশকে আমি খুব ভালবাসতাম। ও আর আমি তো প্রায় একসাথেই কোলে-পিঠে বড় হলাম। এরকম দুম করে চলে গেলো ভাবতেই পারছি না। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল পড়ল ওকে আর দেখবো না ভেবে।

এদিকে অনেক কিছু ঘটে গেছে। দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে। সবাই নাকি কংগ্রেসী। মানুষজন এখন নাকি অনেক বেশি স্বাধীন। ওসব শুনি, শহরের বাবুরা জুরি গাড়ী করে মাঝে মধ্যে গ্রামে এলে। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারি না। দেখি এই হতভাগ্য লোকগুলো সব তো একই আছে, একই কাজ করছে, একই ভাবে উদয়াস্ত খেটে চলেছে। কই তাদের তো কিছু পরিবর্তন হয়নি! জমিদার প্রথা বিলোপ হয়েছে। তার বদলে সবাই নাকি পার্টি করে, জনগণের পার্টি। আমি দেখতে থাকি চোখ মেলে ওই দিকে বড় রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত। লোকজন এখন বিকালে মাঠে এসে বসে। শুনছি নাকি এই ছোট ইস্কুলের ওদিকটায় বড় ইস্কুল হবে। বেশ জমজমাট ব্যাপার স্যাপার। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে। মাঝে মধ্যে আমারই কয়েকটা ডাল ভেঙে নিয়ে ছড়ি করে।

আমার পাশের বকুল ভাই এখন বেশ বড় হয়ে উঠছে। বেশ ঝাঁকড়া হয়েছে, আমাদের যখন ফুল আসে তখন কত যে পতঙ্গ আসে আমার মধু খাবে বলে, তার কথা আর কি বলি। সবসময় তারা গুন্ গুন্ করে গান শোনায়। আমিও যতটা পারি তাদের খাওয়াতে চাই। তা খাক না, যতটা পারুক। বেশ ভালো লাগে। সেবার গ্রীষ্মতে যখন কচি পাতা এলো আর গাছ জুড়িয়ে ফুলের মেলা নামলো, ইস্কুলের ওই বাচ্চাগুলোর সে কি হুটোপুটি আমাকে ঘিরে। দিনরাত আমার ঝরে যাওয়া ফুলগুলো নিয়ে মধু খেতে ব্যস্ত না হলে পাপড়ি দিয়ে বাঁশি; টিফিন সময় এক ছুটে সব আমার ছায়ায়। ওদিকে বট, অশ্বত্থদা দের তলায় কোনো ভিড়ই নেই। তবে ওই দিকে যে আম গাছগুলো, সেখানে কিছু দুরন্ত বাচ্চাদের ভিড়, ঢিল ছুড়ে আম পাড়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারপর সেই কাঁচা আমগুলো বিটনুন আর লঙ্কা মাখিয়ে খেঁতো করে আমার ছায়ায় বসে খায়। একদিন সকালে ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ার আগে দেখি একটা ছোট্ট ছেলে একমনে মাথা উচু করে আমাকে দেখছে। ছেলেটার খালি পা, দোহারা চেহারা, চুলগুলো রুক্ষ। তেল দিতে পারে না বোঝা যায়। সে দেখি আসতে আসতে

আমার পাশে এসে বসে, আমার গুঁড়ি টা কে হাত দিয়ে জড়িয়ে কি বোঝার চেষ্টা করছে। হয়তো দেখছে আমার প্রাণ আছে কিনা কি জানি কি ভাবছে। খুব মায়ালু চোখে দূরে কোথায় যেন তাকিয়ে আছে। দূর থেকে কেউ একজন ডাকলো "বাবলা চলে আয় এদিকে, ঘণ্টা পড়বে এখুনি"; যাক নামটা তো জানা হলো। মোটামুটি আমি সবার নাম জানি, বছরের পর বছর ধরে এরা পড়তে আসে আবার চলে যাই। কত জন বড় হলো, আবার বৃদ্ধ হলো। কত মেয়ের বিয়ে হলো, অন্য গাঁয়ে তারাতো আমার পাশের রাস্তা দিয়েই গেলো শ্বশুরবাড়ি।

বড় ইস্কুলের ভিত খোঁড়া চলছে ওই পশ্চিম দিকটায়। আমার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার মত দূরে, ওদিকটায় আগে ভাগাড় ছিল। সেসব জঙ্গল কেটে মাটি সমান করে জোর কদমে কাজ চলছে। অস্থায়ী শ্রমিকদের কয়েকটা ঝুপরি পড়েছে। সন্ধ্যে হলেই টিম টিম করে পিদিমের আলো জ্বলে ওঠে। যেন মনে হয় কয়েকটা জোনাকি এদিক ওদিক জ্বলছে। ওরা ভাত রান্না করে আমাদেরই পড়ে থাকা ডালপালা জোগাড় করে। আর জমি থেকে পড়ে থাকা কিছু আলু, বন কচু সিদ্ধ করে খায়। সপ্তাহান্তে গ্রামের মুদি দোকান থেকে সারা সপ্তাহের জন্য কাঁচা মাল আসে। এখন মোটামুটি সব সময় হই হই চলছে। শীতের কাপুনিটা এখন অনেকটাই কম। মাঠগুলো আলু তোলার পর ধূসর রং ধারণ করেছে। এখন আমি অনেকটাই লম্বা আর বড় হয়েছি। মাথা তুলে তাকালে ওই দূরের শিমুলতলার খালটা দেখা যায়। ওটাই একমাত্র কৃষকদের ভরসা চাষ বাসের জন্য, তবে জল থাকে। শুনছি সরকার থেকে আরো জলের ব্যবস্থা করবে দামোদরের জল ওই খালে ঢুকিয়ে। ভালই হবে তাহলে, এই অঞ্চলের চেহারাটা একদম বদলে যাবে। সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে চারিদিক। গ্রামের ওই মাঝে মুখুজ্জেদেরদের যে বড় কালীমন্দিরটা আছে, তার খাঁজে খাঁজে টেরাকোটা করা চূড়াটা আমি বেশ দেখতে পাই। অন্যদিকে তাকালে মসজিদের মাঠ দেখা যায়। দূরে ওই দিকটায় পুলের ধার বরাবর শুনছি বড় রাস্তা হচ্ছে। তবে আমাদের এদিকটাই নয়। ওই যে আম বাগানের বড় রাস্তাটা হাবিবপুর গঞ্জের দিকে চলে গেছে, ওইটাতে বাস চলবে নাকি। লোকজনকে আর পালকি, গরুর গাড়িতে যেতে হবে না। দেখতে দেখতে বড় ইস্কুলবাড়ি মাথা তুলছে। এই ছোট ইস্কুলের মত খড়ের চালাই হবে মনে হচ্ছে । কি জানি টিনও দিতে পারে। এদিকের ৩-৪ টে গ্রামের মধ্যে কোনো বড় ইস্কুল নেই, বড় ইস্কুল ওই হাবিবপুরের দিকেই আছে। আমার এখান থেকে কিলোমিটার পাঁচ তো হবেই। সকালে দেখি কিছু ছেলেমেয়েরা ধুতি পরে, এক পাড় দেওয়া শাড়ি পড়ে হেঁটে যায়।

এদিকে তো বলাই হয়নি, এর মধ্যে আমার সাথে বাবলার বেশ ভাব হয়েছে। সে ইস্কুলে এসে একবার আমার গুঁড়িটাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও জড়িয়ে ধরে। ওর ছোট্ট বুকের হৃৎস্পন্দন আমি ঠিক বুঝতে পারি। আমারটা বোঝে কিনা কি জানে। কথায় কথায় ও একদিন চুপি চুপি বললো, ও পলাশের একমাত্র নাতি। ওর দাদু নাকি আমার কথা ওদের সন্ধেবেলায় গল্প করতো। সেই থেকেই নাকি ও ঠিক করেছিল, একটু বড় হয়ে ইস্কুলে ভর্তি হলে ও আমার সাথে ভাব জমাবে। আমার কাছ থেকে গল্প শুনবে। এখন মনে হচ্ছে ইস্ আমি যদি কথা বলতে পারতাম। তাহলে কত কাহিনীই ওকে শোনাতে পারতাম। সে যাই হোক, টিফিন বেলা দুদ্দাড় করে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে ভাবে বেরিয়ে আসে মনে হয় আমিও যদি ওদের মতো ছুটে চলতে পারতাম। আমার পাশের বকুল গাছটাতে ফুলে ভরে উঠেছে। সাদা সাদা ছোট্ট ফুল, নিচের দিকটা যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো। কি যে ভালো লাগে গন্ধ নিতে। ছেলে মেয়ের দল এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে। নামেই টিফিন, কয়েকজন বাদে করো কাছেই টিফিন নেই। বেশির ভাগ চাষী, জন মজুর পরিবারের ছেলে মেয়ে। ওরা সকাল বেলা ভাত খেয়ে ইস্কুলে আসে আবার দুপুর-বিকালে বাড়ি ফিরে খায়। তাই এই সময়টা ওরা বকুল গাছটার ডালগুলোতে ঝুলে ঝুলে ঝালঝুপ্পা খেলে। বকুলের কষ্ট হয় বুঝতে পারি। কিন্তু কচি কাঁচাদের দুষ্টুমি ভালবাসাতে সবার মন ভালো হয়ে যায়, মানিয়ে নেয়।

দেখতে দেখতে বেশ কবছর কেটে গেলো। বাবলা আজও আসে ওর দাদুর মত। এদিকটায় এখন বিকালে গ্রামের ছেলেরা ফুটবল খেলে। আমার পাশের রাস্তাটাতেও মোরাম পড়ছে। আর শুনছি নাকি খানা-খন্দ থাকবে না। সমাজের ভালই উন্নতি হচ্ছে। গ্রামে নাকি আলো জ্বলবে, তাই এখন খুঁটি পোতা চলছে। ওই খুঁটির তার দিয়ে নাকি বিদ্যুৎ যাবে। কি জানি বাবা, আরো কত কিছু দেখবো! আমাদের সামনের খেলার মাঠটাতে বাচ্চাদের খেলার জন্য পঞ্চায়েত থেকে কয়েকটা কৃত্রিম কাঠামো করে দিয়েছে। বড় ইস্কুল ও শুরু হয়ে গেছে। ওই ইস্কুলে আশেপাশের গ্রাম থেকেও ছেলে মেয়েরা পড়তে আসে মাঠের রাস্তা ধরে। এর মধ্যে ইস্কুলগুলো পাকা হয়েছে, তবে টিনের চাল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়লে ওই চালের ওপর একটা সুমধুর শব্দ তৈরী হয়। আমি কান পেতে শুনি। কি যে ভালো লাগে। তবে একবার বৃষ্টির সাথে দমকা হাওয়ায় ইস্কুলের একদিককার চাল উড়ে গেলো। সে কি কান্ড। পুরো ইস্কুল জলমগ্ন। আশেপাশের মাঠ ঘাট পুরো জলে ডুবে আছে টানা বৃষ্টিতে। সেই জন্য ইস্কুলে ও ছুটি চলছিল। কয়েকটা গোসাপ আবার এটা ওদের ঘর মনে করে শ্রেণীকক্ষে ঢুকে বসেছিল। জল নামার পরও ওরা বেরোতে পারিনি। তারপর যেদিন ইস্কুল খুললো সে এক তুলকালাম কান্ড! হেডমাস্টার স্টাফ রুমে ওই কাণ্ড দেখে পড়ি কি মড়ি করে দে ছুট। তারপর লোকজন ডেকে এনে দরজা খুলে এক-এক করে চারটে গোসাপ বার করা হলো। একটা ঢ্যামনা সাপ বলা নেই, কওয়া নেই, কোথা থেকে বেড়িয়ে হুস করে পুকুর পাড়ের দিকে চলে গেল। বাচ্চার দল গোল হয়ে দাড়িয়ে সাপগুলোর মজা দেখছিল। সত্যিই কি মজা? ওদের কাছে এটাই জীবন মরণ সমস্যা। সাপেরা তো হিস-হিসিয়ে সেই কথাই আমাকে বলে। একেই তো ঠান্ডা রক্তের প্রাণী, ভয়ে সেঁধিয়ে থাকে সব সময়।

সেদিন এক ঘটনা ঘটলো, তখন শরৎ পড়েছে। এদিক, ওদিক, খালের পাড়গুলো কাশ ফুলে ঢেকে আছে। অনেককেই এখন তাদের বাবারা ইস্কুলে দিতে আসে সাইকেল করে। সবার সঙ্গে এখন একটা টিনের বাক্স থাকে নাহলে চটের ব্যাগ। বই পত্র তো সরকার

থেকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেয়। ছেলেদের পরনে সব হাফ প্যান্ট আর মেয়েরা ফ্রক পড়ে। বেশ ভালো লাগে সকলকে এক ড্রেসে দেখে। ওদিকে বড় ইস্কুলেও তাই, কলরব করতে করতে বড় ক্লাসের মেয়েরা শাড়ী পড়ে দল বেঁধে বাড়ি ফেরে ছুটির সময়। তবে ওই দিকটার খবর অতটা নেওয়া হয় না। একটু দূরে তো। আমার সব কিছুই এই ছোট ইস্কুলকে ঘিরে। তো সেই দিন সকালে ঠিক স্কুল বসার আগে, ইস্কুলের পাশে যে মাস্টারদের বসার ঘর আছে, তার পাশের বেল গাছের তলায় একটা ছোট্ট ঝড় এর সৃষ্টি হলো। সেটা শুধু নিচ থেকে ওপরে পর্য্যন্ত উঠে যেতে শুরু করল আর তার সাথে ডাল পালা পাতা সব কিছু ঘুরতে শুরু করল। দেখে কেমন একটা ভয় ভয় লাগছিল। তারপর ওই ঝড় দেখছি এক জায়গা থেকে দূরে যেতে লাগলো। ইস্কুলের কচিকাঁচাগুলো তার পেছনে ছুটতে শুরু করলো। একজন মাষ্টারমশাই বেরিয়ে এসে সব কটাকে কঞ্চি ছড়ি নিয়ে তাড়া করলো ঘরে ঢোকানোর জন্য। সে এক দারুন দৃশ্য। মাষ্টারমশাই সারা মাঠময় ছুটছে, কে কার কথা শোনে! যেন কুমিরডাঙ্গা খেলছে। পরে জেনেছিলাম ওই ধরনের ঝড়কে নাকি টর্নেডো বলে। গ্রামে আবার খবর রটে গেলো ব্রহ্ম্যদৈত্য বাবা ভড় করেছিল নাকি ওই দিন। সেই জন্য একদিন পূজো হয়ে গেলো বেল গাছের তলায় তাকে শান্ত রাখার জন্য। সেই থেকে ওই বেল তলা খুব কম ছেলে-মেয়েই যেতো যদি ব্রহ্ম্যদৈত্য তাদের গাছের ওপর তুলে নেয়। শীতের সময়টা দারুণ কাটে। মিঠে রোদ গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকি। আর এই সময়টা দুই ইস্কুলের খেলার প্রতিযোগিতার সময়। খুব হইহই করে কয়েকটা দিন কাটে। কত যে খেলা দেখি! লেবু দৌড়, বস্তা দৌড়, ছোটাছুটি, হাই জাম্প, লং জাম্প, ফুটবল ম্যাচ আরো কতো কি। এখান থেকে এরা নির্বাচিত হয়ে নাকি পরের স্তরে যায়। সেই সময় আমার ছায়ায়, বকুলের ছায়ায়, দূরে আমগাছগুলোর ছায়ায় দল বেঁধে মেয়েরা বসে জিরোতে থাকে । ছেলের দল মাঠে খেলে। তার মানে এই নয় আবার মেয়েরা খেলে না। ওরাও খেলে, তবে ওরা বসে বসে ওদের পরিবারের গল্প, টুকটাক টিউশনির গল্প, প্রথম প্রেমের গল্প বলে। আমি মন দিয়ে শুনি।

গত চার-পাঁচ বছরে, দেখছি লোকজন অনুষ্ঠানে বাহারি পোশাক পড়ছে। হাঁটা ছেড়ে, সাইকেল নিয়ে ঘুরছে, গ্রামের মধ্যে একটা ছাতু ইস্কুল হয়েছে, হাসপাতালের জমি খোঁজা হচ্ছে, ওই দূরে ক্যানাল হচ্ছে, আরো এটা সেটা হচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের জীবনযাত্রার আর সভ্যতার উন্নয়নের গতি বেশ বেড়ে চলেছে। সেই সময় একদিন সকালে শুনলাম আমাদের বড় ইস্কুলের কেউ একজন পড়াশোনায় বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে। সবাই বলে নাকি এটা পুরো দেশের পরীক্ষা, আগে এরকম এত ভালো কেউ করেনি। মাস্টারমশাইদের সেই কি ছোটাছুটি। পরে সেই ছেলেটাকে জানলাম। আমাদের চন্দন! ছোট ইস্কুলে পড়ার সময় বকুল গাছটা তে খুব হুটোপুটি করত। ডালে বসে রাস্তা দেখতো। আমার গাছের তলাতে মধু খেতে আর প্লাস্টিক না পলিথিন (নতুন জিনিষ নাকি আবিষ্কার হয়েছে) ওড়াতে আসতো। এখানে সবাই বলে চিন কাগজ, সেই মাঠের পর মাঠ তারা ঢিল বেঁধে চিন-কাগজ উড়িয়ে ছুটত। হাওয়াতে খবরটা শুনে গর্বে বুক ফুলে গেলো। যাক আমাদের এই ছোট্ট চত্বর এর পরিচিতি বাড়ল। তারপর আরো দূর দূর থেকে ছেলে মেয়েরা পড়তে আসতে লাগলো। চন্দন তারপরও আরো কিছুদিন বিকালে রোজকার মত খেলতে আসতো। আমার গোড়াতে সাইকেলটা রেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলত। পরে একদিন বাবলার মুখে শুনলাম ও অন্য কোনো শহরে পড়তে গেছে। বাবলা ও খুব খুশি। ও চায় ওর ছেলে-মেয়েটাও যেন ভালো করে পড়ে। ওর দিন মজুরি করে যতটা ক্ষমতা তাদের পড়াবে। সত্যিই একটা ভালো রেজাল্ট যেন পার্বতীপুর আর তার আশে পাশের গ্রামগুলোকে চনমনে করে দিয়েছে।

মাস যায়, বছর ঘোরে। গ্রাম গুলোতে ছোট ছোট পট পরিবর্তন হতে থাকে। তবে মোটের ওপর গ্রাম্য জীবন নিস্তরঙ্গ, কিন্তু একটা স্নিগ্ধতা আছে, মায়া মমতায় মাখানো যেনো পথঘাট, যেমন সকালের কুয়াশাতে, ঠিক তেমন বর্ষার ঝড়ো ঝড়ো বৃষ্টিতে, বা শরতের কাশ বনের মাথার দুলুনিতে। এ এক অনন্য অনুভূতি, তাই হয়ত মানুষেরা বলে মায়াময় জগৎ। যদিও আমি বিশ্ব দেখিনি, তাই জানিনা কিছু। তবে আমি দেখেছি গ্রাম-বাংলার রূপ। এটাই তো আমার পৃথিবী, বিশ্ব সংসার। এইভাবেই বেশ চলছিল, হঠাৎ জানিনা কেন সেদিন অশ্বত্থদা দখিনা হাওয়া চলার সময় কানে কানে বলে গেল আমরা বুড়ো হচ্ছি, ঝুড়ি নামছে, তুই এখন এই এলাকার মধ্যে সবথেকে শক্ত সমর্থ। সবদিক দেখে শুনে চলিস সবার ভালো মন্দ নিয়ে থাকিস। কেনো কথাটা বললো, ঠিক বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম আরো কিছুদিন পর যখন বাবলা বলে গেলো। সেদিন বাবলা দুপুরের খাবার মাঠ থেকে এনে আমার তলায় বসে খাচ্ছিল। সাথে আরও ২-৩ জন সঙ্গী ছিল। এখন ইস্কুলে কল থাকার জন্য ওদের জল খেতে সুবিধা হয়। তাই অনেক চাষী মজুর দুপুরের সময় এদিকটায় এসে খাবার খায়। সেইসময় বাবলা বলছিল এই আমাদের গ্রামের রাস্তা নাকি পাকা হবে আরো চওড়া হবে। এখান দিয়ে নাকি বাস চলবে। এই খবরই কি অশ্বত্থদার কানে এসেছিল। শুনলাম আরো অনেক কিছু। বাস রাস্তা হওয়ার জন্য ইস্কুলগুলোতে প্রাচীর দেবে রাস্তা বরাবর। পঞ্চায়েত অর্ধেক টাকা দেবে, বাকি টাকা নাকি ইস্কুলকে দিতে হবে। চমকে উঠলো বুকটা। তাহলে আমাদের কি হবে! আমার বয়স ১০০ বছর হতে চলল, বেশ পুষ্টু দাগ পড়েছে কাণ্ডতে বুঝতে পারি। কিন্তু পাশের করমচা গাছ, বকুল গাছ, জাম গাছ, শিরীষ গাছদের কি হবে! শিরীষ গাছ ছাড়া বাকি তো সবাই অনেক ছোট। মেরে কেটে ৩০-৫০ বছরের মধ্যে সবার বয়স। এর দুই বছরের মধ্যেই চারিদিকে রাস্তা জুড়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে গেলো। বাচ্চাদের তখন ইস্কুলে আসতে একটু সমস্যা হচ্ছিল রাস্তায় মাঝে মধ্যে কাটা। পাশের জমিগুলো প্রায় কয়েক ফুট ভরাট হতে থাকলো। শহর থেকে একদল লোক এসে কি সব ফিতে দিয়ে মাপজোক করে গেলো। দেখলাম আমাকে ধরে আর প্রায় বাকি সব গাছগুলোকে ধরে চলল সেই সব অঙ্ক কষা। তারপরদিন কোথা থেকে বাবলা এসে উদভ্রান্তর মত হাজির হলো। বললো "আমি আজ কাজে যাইনি। ভালো লাগছে না"। বললো, "তুই কাটা পড়বি। ওই ইস্কুলের চত্বরের মধ্যে দুটো আমগাছ হয়তো

বেঁচে যাবে। তোদের বিক্রি করে টাকা হবে, সেই টাকা দিয়ে পাঁচিল হবে, রাস্তা হবে", বলে কেঁদে ফেলল।

নিজের এমন অকাল মৃত্যুঘণ্টা শুনে একজনের কি আর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। করে আমার মন পিছিয়ে গেল ১১০-১১৫ বছর, চোখের সামনে সব ঘটনা আসতে লাগলো। চোখগুলো ভিজে ঝাপসা হয়ে গেলো। টুপ করে কি একটা ফোঁটা পড়ল বাবলার গায়ে! ও কি বুঝতে পারলো আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে? একটা অজানা মৃত্যু আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করলো। আমি নিজেই জানিনা না কবে আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমি জানি সে আসছে। তাহলে কি অন্য গাছ ভাইরা জানে এ কথা? কি করে বলি সকলকে আমাদের মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে? একটা অজানা আতঙ্কের চোরা স্রোত সারা দেশময় বয়ে গেলো, মনে হলো আমি কাঁপছি। আবার বাবলার গলার আওয়াজ শুনে আমার চিন্তা স্রোতে ভাঁটা পড়ল। ও বলে চলল, "আমরা কি আর করি বল, আমরা তো প্রজা, আমাদের তো কিছুই নেই এই ভালবাসা ছাড়া। সবাই বলে নাকি এই ভাবেই উন্নয়ন হয়, হয়ে এসেছে। কত জনকে এর আগে আত্মত্যাগ দিতে হয়েছে তার খবরই বা কে রাখে। কিন্তু আমি তোকে আজীবন ভালোবেসে যাবো। তোর গল্প করে যাবো আমার পরের প্রজন্মকে, বলে যাবো আমার দাদুর সাথে তোর সম্পর্কের কথা।" মানুষ জাতিটাই অবোধ্য। এত বিচিত্রময়! কেউ আমাদেরকে মেরে ফেলতে চায়, কেউ আবার জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। এটাই তো পাওয়া আমার এই ছোট্ট জীবনে। কিন্তু এই পাখিগুলোর কি হবে? তারা কোথায় যাবে? মৌমাছিরা কি আবার আসবে মধু খেতে? তারা কি অন্য বাসা খুঁজে নেবে? না আর ভাবতে পারছি না। সব কিছু আমার কাছে কেমন যেনো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, প্রাণ থেকেও কেমন যেন নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কর্তব্য তো আমাকে করতে হবে। সেদিন বিকালে যখন দমকা হাওয়া বইলো দখিন-পুব কোণ থেকে, আমি আমার ডাল পালা নেড়ে এই খবর সারা পাড়াময় জানিয়ে দিলাম। সব থেকে ভেঙে পড়ল বকুল ভাই। সে কি কান্না। বললো জানো, আমি ছাড়া এই তল্লাটে তো আর কেউ বকুল নেই। আমি মারা যাবার সাথে সাথে আমার পরিবারকে মনে হয় সবাই ভুলে যাবে, তোমরা তাও এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছো। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম "আমি তার ব্যবস্থা করব বকুল, কাঁদিস না।" আমরা তো আর অন্য প্রাণীদের মত ছুটে গিয়ে, জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারি না, সমবেদনা জানাতে পারি না, ভালো বাসতে পারিনা। আমরা তো চলৎশক্তিহীন। আমরা তো অব্যক্ত জীবনের কাহিনী বয়ে চলি যুগ যুগান্ত ধরে। আমাদের কথা কেউ কি বোঝে? কেউ কি লেখে? কি জানি! যাক, প্রথম অভিঘাতটা আসার পর থেকে আমাদের গাছ পাড়া কেমন যেনো থম মেরে গেছে। আম গাছগুলোও ভালো নেই। তারা জানিয়েছে ওরা নিজেরাই বুঝতে পারছে না সকলকে হারিয়ে তারা একা একা থাকবে কেমন করে। সত্যিই জীবন কত মহার্ঘ্য। এখন প্রতিদিন বাবলা আসে, আরো দুতিন জন কচিকাঁচাকে নিয়ে। ওর ছেলে মেয়েকেও দেখি তার মধ্যে। আমাকে নিয়ে ও কত কথা বলে চলে প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সকলে অবাক হয়ে শোনে। আমার ভালো লাগে ওদের দেখে। এটা অন্তত বুঝতে পারি একটা প্রজন্ম আমাকে মনে রাখবে।

দিন যায়, অমাবস্যার কালো কুচকুচে রাত নামে। রাস্তার কাজ ঢিমে তালে এগোচ্ছে। প্রখর গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা এলো, সেটাই আমার জীবনের শেষ বর্ষা। ভালো করে ভিজলাম এবার, আমাদের সারা ইস্কুল চত্বর যেনো সবুজে সবুজ হয়ে উঠল। সকলের একটা প্রচেষ্টা যেন দেখো আমরা কতটা সবুজ, আমরা কতটা নবীন। চারিদিকে জলে থৈ-থৈ, তার মাঝে আমরা যেন সবুজের চাদর। দেখলেও প্রাণ জুড়িয়ে আসে। কি অতি বৃষ্টিতে রাস্তা কাটার জন্য যে গর্ত গুলো খোঁড়া হয়েছে, সেগুলো জলে ভর্তি হয়ে যাওয়ায়, রাস্তা-জলের পার্থক্য করা মুশকিল। সেইদিন শহর থেকে কোনো গাছ কাটা বাবুদের গাড়ি যাওয়ার পথে রাস্তা ঠিক না করতে পেরে উল্টে গেলো। দু-তিন জনতো বেশ ভালো মতো আহত। তড়িঘড়ি করে লোকজন এসে তাদের গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলো।

বর্ষার দুটো মাস আমরা খুব আনন্দে কাটালাম। হয়তো এটাই আমার জীবনের সেরা আনন্দ। এ এক অন্য অনুভূতি। শরৎ শুরু হতেই আবার লোকজনের হৈ-হুল্লোড় শুরি হলো আমাদের গাছপাড়াকে জুড়ে। চোখের সামনে দেখলাম একে একে গাছ ভাইবোনেরা কাটা পড়ছে। তারপর তাদের ডাল পালাগুলো দা, কুড়ুল দিয়ে ছেঁটে, দড়ি দিয়ে বেঁধে বান্ডিল করে ট্রাক্টরে তোলা হতে লাগলো। মনে পড়ে যাচ্ছে, আগে মোষ বা গরুর গাড়ি ছিল পণ্য পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম, আর এখন ট্রাক্টর। কালের গতির সাথে জীবন যাত্রার গতি তাল মেলাতে চাইছে। চোখের সামনে অশ্বত্থদা কে ৫-৬ জন মজুর মিলে কেটে ফেলল। অত বড় গাছটা ধপ করে মাটিতে পড়ল। কয়েকটা ছাগল গরু কোথা থেকে দুদ্দাড় করে এসে পাতা খেতে শুরু করলো। পার্বতীপুর থেকে অনেক লোকজন এসেছে গাছ কাটা দেখতে, অনেকেই আবার তাদের রান্নার জ্বালানী সংগ্রহ করছে। মানুষদের মধ্যে যেন উৎসবের আমেজ, প্রগতির চাকা যেনো এগিয়ে চলছে দুর্দম গতি নিয়ে। আজ সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমার বাম দিকটা ফাঁকা হয়ে গেলো। কাল আমাকে দিয়ে মনে হচ্ছে এই মানবসভ্যতার উন্নয়নের পথ চলা শুভারম্ভ হবে। শুধুই তো আজ রাতটুকু, আমিও কাল থেকে বিলীন হয়ে যাব প্রকৃতির কোলে। স্মৃতি হয়ে থেকো যাবো। কখন যে সারাটা দেহ ঝিরিঝিরি কান্নায় সিক্ত হয়ে গেছে, খেয়ালই করিনি। ভাবনার হঠাৎই ছেদ পড়ল বাবলার আর্ত চিৎকারে। ও কি পাগল হয়ে গেছে? কি সব আমার গায়ে লাল রং লেপে চলেছে আর আমাকে ধরে কি যেনো বলছে, আর বারবার আমার নিচে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে আমাকে দেখছে। এখন সন্ধ্যা হয় হয়, রাত নামছে পার্বতীপুরে। কেমন যেন একটা কাটা-কাটা গন্ধ চারিদিকে। টুপ করে আমার কয়েকটা ছোট ছোট পাতা ফেললাম ওর মাথার ওপরে। জানালাম, আমি এখনও জেগে আছি, জীবন্ত। চন্দন ও কি এসেছে? ওই দূরে মনে হচ্ছে কোন একটা ছেলে সাইকেল করে এদিকটাই আসছে। হ্যাঁ, চন্দনই তো। গুটি-গুটি করে এসে সাইকেলটা রেখে দিলো আমার গুঁড়িতে।

দিয়ে বাবলা কে বলল, "চলো বাবলাকাকা, বাড়ি যাবে। আমি কথা দিলাম আমাদের এই প্রিয় কনকচূড়া গাছকে আমাদের স্মৃতিপটে রাখবো। কাউকে ভুলতে দেবো না"। ও হয়তো আজ বা কাল এসেছে, হয়তো ছুটি পেয়েছে, হয়তো বা শুনেছে ওদের প্রিয় গাছ ভরা ইস্কুলের মাঠ আজ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বাবলা ওর কাঁধে মাথা রেখে গুমরে কেঁদে উঠলো। বললো, "চন্দন কথা রাখিস কিন্তু। আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমরা আর কিবা করতে পারি। তোদের মাধ্যমেই এরা জীবন্ত হয়ে থাকবে"। কি যে ভালো লাগছে এসব দর্শনের কথা শুনে। মনে হচ্ছে মৃত্যুই তো আমাকে অমরত্ব দেবে। এই মারা যাওয়া আনন্দের। আমরা থেকে যাবো অনেকেরই হৃদয়ের মণিকোঠায়।

দেখতে দেখতে প্রতিদিনের মত পুব আকাশ লাল হয়ে গেলো। আজ কি আকাশটা বেশীই লাল দেখাচ্ছে। কে জানে! কর্মব্যস্ততা বাড়ল। আমিও মনটাকে শক্ত করে দাঁড়ালাম। বকুলকে বললাম, "এটাই তো জীবন। কাল হয়তো অন্য কোনোখানে, আবার আমরা মাটি ফুঁড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জন্ম নেব। এই তো মহাকালের লীলাখেলা। মন শক্ত রাখ"। বলতে বলতেই প্রথম কুড়ালের কোপটা পড়ল। তারপর বারবার। কষ্ট হচ্ছিল, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সারা মন দেহ আচ্ছন্ন করে ফেললো। মনে হচ্ছে কেমন একটা অবশ হয়ে যাচ্ছি। আমার বড় বড় ডাল গুলো দড়ি বেঁধে কেটে কেটে নামানো হচ্ছে। ডাল ছেঁটে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। সারা গাঁ-গেরামের লোক ছুটে এসেছে যেন। আর কিছু মনে নেই আমার। একটা অতল নিস্তব্ধতা।

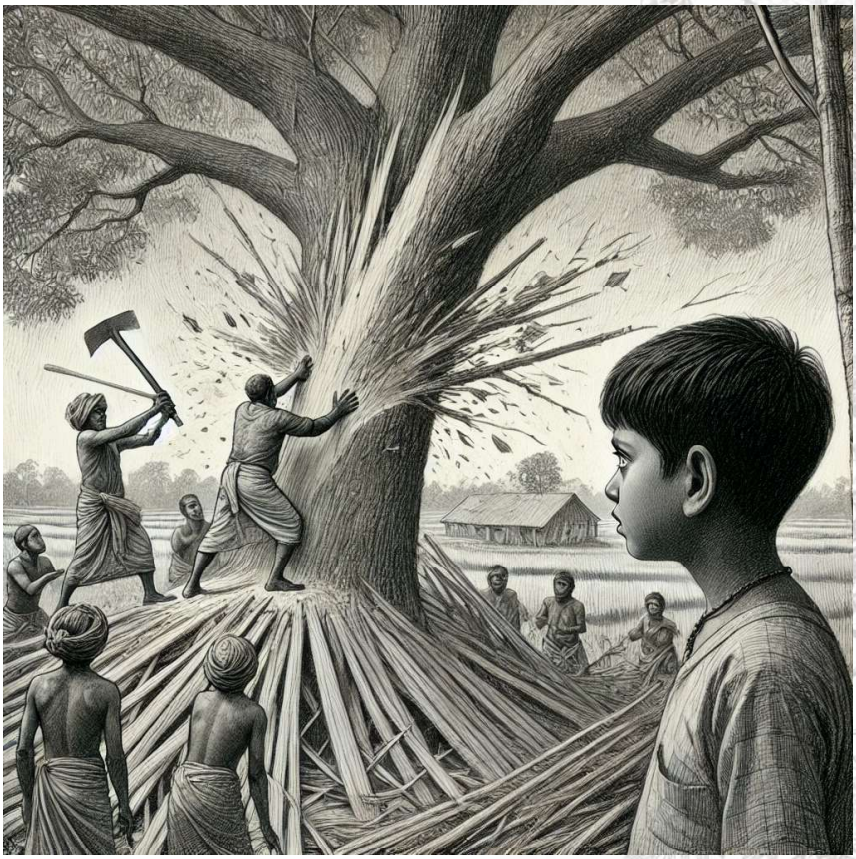

বলতে বলতেই প্রথম কুড়ালের কোপটা পড়ল

পরের কথা বকুলের চোখে : দেখতে দেখতে অত বড় মহীরুহ হয়ে ওঠা কনকদা কেমন ছটফট করতে করতে নিচে পড়ে গেলো। কি আশ্চর্য তার মাঝেও দাদা মৃদু হাসছিল। কিসের বাসনায়? অমরত্ব না সভ্যতা কে এগিয়ে নিয়ে চলার আনন্দে? কি জানি! গুঁড়িটা থেকে কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে রক্ত বার করছে। বয়সের গোলগোল চাকাগুলো কেমন যেনো হাঁ করে আকাশ দেখছে। রক্তর রং তো শুধু লাল নয়। দুটো গাড়িতে বোঝাই করা হলো কনকদাকে। তারপর ভালো করে বেঁধে নিয়ে সবাই চলল কোন এক অজানা গন্তব্যে। আমার এখন কনকদার কথায় খুব বিশ্বাস হতে শুরু করেছে। আমরা থাকবো, বাঁচবো এই গ্রাম বাংলার মাঠে প্রান্তরে, নগরে-বন্দরে। যেমন হয়ে আসছে সভ্যতার ঊষা লগ্ন থেকে, আমরা আবার মাথা তুলে চাইবো ওই অনন্ত আকাশের দিকে। লোকজনের কোলাহল ধীরে ধীরে বাড়ছে, আমার দিকে আসছে। দড়ি বাঁধা হচ্ছে আমার ডালে ডালে। কিছু গরীব কাঠুরে আমার ওপর চড়ে বসেছে, এবার আমার পালা।

The silence witness of the dusk

Picture : Parag Desai

The grandeur of the night

Picture : Dhanashree Naik

Mori Bera–Romance with the Wild

Debjani Guha Basu

Mori Bera, near Jawai Dam within Pali district of Rajasthan, closely commutable from Jaipur, is a rustic village nestled cozily amidst the Aravalli Hills. On a February afternoon as the winter was bidding her last good byes, I arrived there. The platform of this quaint little village station is shorter than the train. A village man clad in traditional clothes, came rushing as I jumped off to the ground. Mahadeo Singh introduced himself, chauffeur for my destination.

The scenics of Mori Bera

In a small timeworn car, we headed for the Leopard Camp, my destination. The road was bumpy having only sand mixed mud and rocks. We passed through rugged lands comprising of Khejri forests, scientifically known as Prosopis cineraria, about 9-16 ft in height, leaves bipinnate, branches thorned along the internodes, having small creamy yellow coloured flowers, followed by seeds in pods. Even in February it was scorching hot with the Sun shining bright on top. Then suddenly amidst the trees the Aravalli hillocks started appearing. Never in my life could I imagine so profound beauty within such immense rough terrain. The red flowers on huge cactus trees, the white cute beauties on roadside bushes captivated my attention.

Mahadeo Singh took pride in his land and explained to me every object of nature that we passed by. His appearance was so befitting with the surrounding. Well past 50 years, the thin lines on his face spoke of his life experiences complimented with a well-oiled huge moustache and grey hairs. He knew these forests and surroundings like the palm of his hands. "I have even seen the leopards so many times madam!", his face gleamed as he spoke.

Half an hour later, we arrived at our destination, 'Varawal Leopard Camp'. A very handsome tall young man in his thirties came to greet me as Mahadeo Singh held my luggage. Pushpendra, owner of the camp and partly, the privately-owned jungle, greeted me. While completing the check-in formalities, a local man in full Rajasthani attire brought in home-made welcome drink. Later, I was shown a fascinating swiss tent – my home for next two days. Pushpendra spoke in low volume and one can make out his well-groomed upbringing as he explained the rules, regulations and my safari details with his perfect diction

and choice of words. Little did I know that time, how much he had in his sleeves to offer. Rajeshwari, Pushpendra's sister, in-charge of hospitality very cheerfully greeted me as well.

I freshened up a bit and headed for an elaborate lunch. Here, I should mention a bit about Pushpendra's background. He is the present-day descendant of the Royal Family who owned the Bera Jungle and surrounding land. Hence his courteous manners and aristocratic appearance. Lunch still depicted the past glory. The homemade ghee smeared hot rotis served straight from tawa, lip smacking dal-batichurma, delicious veg preparations all took each guest back to noble days.

Afternoon siesta was short as I went for my first safari along with much anticipation of the wild. The numerous caves of Aravalli hills shelters leopards, blue bull, hyena and jungle cats. It is also inhabited by water-birds like goose, flamingos, egrets, ducks as well as crocodiles. Bera is unique because there are no roads to the hills. The safari jeep takes tourists up on the hill close to the animals. It is both adventurous and thrilling. First day we could spot a blue bull and some peacocks.

Evening presented itself with local folk music by local musicians. Pushpendra mentioned these musicians earned their livelihood by travelling to places close and far and singing to tourists or wealthy people. The mysterious calls from jungle animals at the background, the deep soulful voice of the singer all led to a mystic feeling. The song depicted the thoughts of a king who has come to the jungle for hunting, seeing a peacock pair he misses his queen. Dinner comprised of authentic royal cuisine prepared by Pushpendra's mother.

Next morning, I woke up hearing some commotion just outside my tent. I hurriedly came out only to be greeted by a beaming Pushpendra. "Have you touched a crocodile ever?" he chuckled as he spoke. Well, obviously I didn't. He gestured behind. Blind-folded and mouth tied with a cloth, a small baby crocodile was being held by few men in the safari jeep! Oh yes, I ran to touch and feel it. The men informed this lost baby was wounded. They have put medicine and will now be released onto the lake water. I appreciated everybody's immense effort to save the creature of nature.

The Aravalli had something in store for me in the afternoon safari. Pushpendra himself drove us to the hill, with information that one leopard with her cubs is shifting places so there is a good reason to believe we can see her. We waited at a place mid-way onto the hill where she lived. Sunset was fast approaching when she popped up her head. What a beauty! I was mesmerized. She curiously looked down, her deep gaze was chilling. Then, she went away as suddenly as she had appeared.

It was a full moon night. Seeing my excitement Pushpendra offered to provide a tour of the jungle at night. After dinner we set out for the jungle. The magical appeal of the moonlit jungle was alluring. Every moment of fear and thrill of adventure made me quiver inside. Just as we went

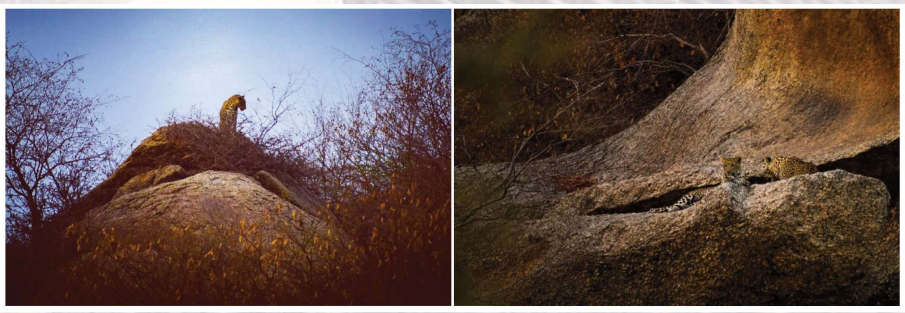

The wilds of Aravalli

inside one of the hills, Pushpendra stopped the jeep. His men threw lights deep inside the jungle where a leopard had just returned from his kill. He was having dinner and as he looked with blood in his mouth, a shiver ran down my spine. An unforgettable experience. Later we watched a blue bull, a jungle cat, hyena and few owls. That night I couldn't sleep thinking about the eyes of the leopard. What a gorgeous animal yet so ruthless!

I was wrong, which I came to know next morning when we visited the local village. Pushpendra bought a lot of sweets, biscuits and chocolates before we reached the village. The day was auspicious due to Holi – the festival of colours. The villagers were playing with colours gleefully, yet when our jeep passed by them, they didn't forget to stop and bow to their "Hukum", their erstwhile Zamindar. It felt like time transported us to Pushpendra's ancestral days.

The small kids of the village excitedly came to us (one of them in traditional attire) carrying small sticks. Our body guards for the day. It is traditional custom of the village to show respect to the Zamindar when he arrived. The gifts delighted the kids. We learnt the leopard often visits the villages for dinner. A cow or goat would be most coveted. However, when someone sleeps in the front yard where the cattle are tied, the leopard does not enter that house. Only when the front yard is empty the leopard chooses to grab one.

The villagers in-turn think they have offered gratitude to the leopard incarnation of their village Goddess. A beautiful co-existence between humans and the wild! Only if the world learnt from them.

Breakfast was served at a beautiful lake-side beside the jungle. Food was laid out on the jeep bonnet. We saw glimpses of traditional respect when guests were served first, then Zamindar and finally the staff. We learnt how the royals cared and helped in leopard conservation. No wonder, despite this being a private jungle, Pushpendra gets some Government aid. The lake was picturesque with flamingos and other migratory birds. We were warned not to go close to the lake as this was also resting place for crocodiles. The jungle and the Aravalli hills, on each side, made the lake look heavenly.

Mahadeo Singh came back in the afternoon to take me back to station. I took a last glimpse at the Aravallis as Mori Bera faded from my vision. I saluted the peaceful cohabitation of the leopard, humans and the benevolent royals. In the world of destruction and agony such coexistence is soothing. Bidding farewell to this dream world, I headed back to city life.

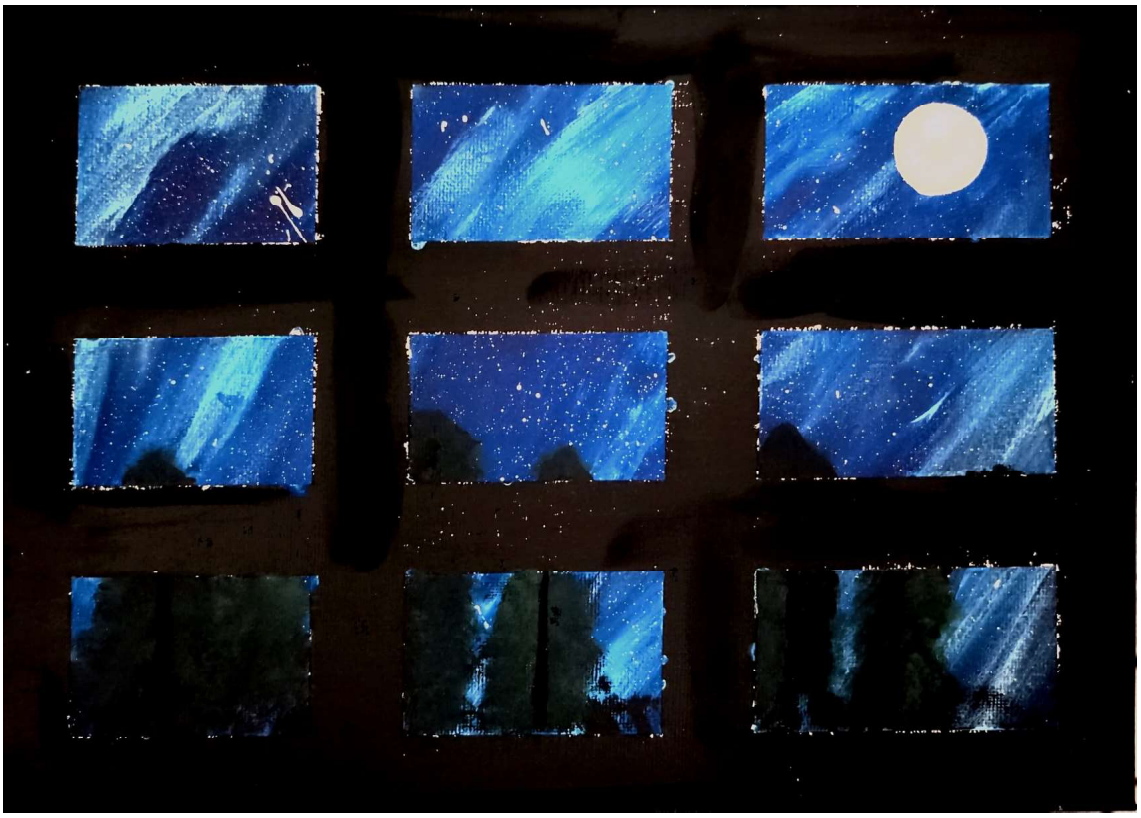

রাতের আলাপ

অঙ্কন : স্নিগ্ধা সাহা

কচি-কাঁচাদের পাতা

গোলক ধাঁধা
Triana Sarkar (3 years)

রাজকন্যার বাড়ি
Srinithi Banerjee (8 years)

আমাদের গ্রাম
Aavisha Dey (8 years)

নীল তিমি
Srihan Saha (6 years)

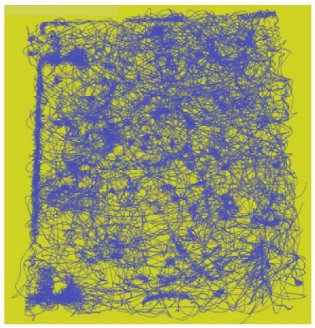

খেরোর খাতা
Mihiparna Das (2.5 years)

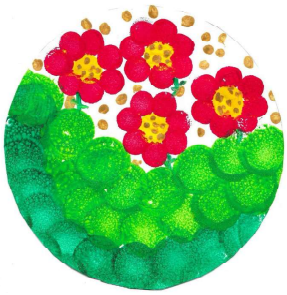

রক্ত-করবী
Aarya Syamal (5 years)

হালুম
Supratim Mandal (2.5 years)

বালির ঢেউ

চিত্রগ্রহণ : শতাব্দ সাহা

কষ্ট কল্পনা

ইঞ্জামামূল আরিফ

কষ্ট কল্পনা

কাঁটাতার, ন্যাড়া গাছ, রুক্ষতার এক ভারী গন্ধে
বুকচাপ লাগে। যদি উড়তে উড়তে একসময়
পাখিটার স্ট্রোক হয়, তখন সেটা দৃশ্যতই এক সিম্ফনি।
পরবর্তী অংশে
কিছু ইতস্তত পালক কথা বলে চলে ...

অসমীকরণ

ধোয়া তুলসীপাতা সেজে ফিরে এলো জল,
তোমার দরজায় ঢাক্কা খেয়ে
মিথ্যাবাদীর শাস্তি।
এই নিয়ে আস্ত এক অসমীকরণ তৈরি হোক —
তা আমি চাইনা। এর চেয়ে বরং
তুমি ফিরে যাও, অন্য আরেকদিন একসাথে
সাঁতার কাটা যাবে।

জঙ্গল

অন্ত স্রোতধারার মাঝে, আকীর্ণ জঙ্গল।
মাঝে মাঝে উদ্ভট কষ্টকল্পনা, সান্ত্বনার আশ্বাস
দিও তুমি।
আমাদের গ্রামে আজকাল বৃষ্টি ঠিকমত হচ্ছে না,
তোমার কী মতামত?
একটার পর একটা আশঙ্কা, এরপর কী হবে কে জানে?
দিবাস্বপ্নে ডাকাতি, পাহাড়-জঙ্গল তোলপাড় করে
ফেলা
কালাপাহাড়। আর ঘুম ভেঙে উঠে সারি-সারি
পিঁপড়ের কঠিন, সুসংহত সাম্রাজ্য।

অঙ্কন : ইঞ্জামামূল আরিফ

নির্যাস

নিয়মমাফিক দ্বিপ্রাহরিক প্রস্তুতি-পর্বে
আপনি শুনতে পেলেন, ৫-ইঞ্চির আধশুকনো দেয়াল
ভেদ করে
একটি আঁশটে গন্ধমাখা বাদ্যযন্ত্র।
সদ্য বর্ষায় একটি নতুন দালানের পরিকল্পনা
করেছিলেন আপনি,
ছাদহীন একটি মাত্র কক্ষ, চারটি প্রাচীর-
সাথে প্রতিটি তলে রাসায়নিক আস্থান।
আর দালানের বাসিন্দারা? প্রত্যেকেই আপনার
পরিচিত।
২৩শে অঘ্রান রাতের অটোরিক্সা বা গত সপ্তাহের
কোনো এক মধ্যরাতে
আচমকা তীব্র প্রশান্তি।
সংখ্যাতীত কীটাণুর মধ্যে একটিমাত্রকে বিজয়ীর
সম্মান,
এ পক্ষপাতের বিরোধিতা করে যাত্রা, এ তরলে
তাদের সলিলসমাধি-
একটি ফ্রয়েডীয় অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

নীলকুঠির কাব্য

অকাল নির্মচাপে শীর্ণ বলিরেখাগুলো
অস্পষ্ট; ভাঙা দেওয়ালের নিচে বুড়ো সরীসৃপ
আর দেয়ালে দেয়ালে নীল এপিটাফ।
মহাজাগতিক আনন্দ দেখে এলাম আজ,
নীলকুঠির আনাচে-কানাচে।

এক মুঠো অভিশাপ

অন্ধকার চড়াই-উতরাই, আগ্রাসী মিথুন ও অন্যান্য
বাধাবিঘ্ন
পেরিয়ে সেই বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াই:
কয়েকটা হলদেটে, ঝুলন্ত কিছু অবয়ব আর
দুর্বোধ্য কোলাজ বই তো না।
কোথায় গেলো সে? আমি
ফের গুনতে বসি জমানো রসদ।
খুব কাছাকাছি ট্রেনের গর্জনে হিসেব গুলিয়ে যায়।

গঙ্গাতীরের কীর্তন

খুব ভোর থেকে অগণিত ভক্তের ভিড়ে মিশে,
শ্যাওলা-ভেজা ঘাটের আপাত-নিরাপদ একটি কোণে,
মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে
একমনে
সদ্য ও বিগতযৌবনার পরিশোধিত বাজারমূল্য তথা
শুল্কমুক্ত এক
(বা একাধিক)
পণ্য পরিবহনের যাবতীয় সম্ভাবনা ও তার থেকে উদ্ভূত
লাভের হিসেবে-নিকেশ
করে চলেছে "একটি ঘাটের মড়া"।
এক্ষেত্রে মহাকাব্যিক পরিণতি কী অসমীচীন?

The Daily Conflicts between Analog Me and Digital Me

Padmanava Sen

Disclaimer - Analog means signals or information represented by a continuously variable physical quantity such as spatial position, voltage etc. I am using it as the opposite to digital.

I work in a digital environment, surrounded by Laptop, desktop and software towards an analog powered digital world (I design electronics in analog domain where real numbers matter beyond the world of bits and bytes). I love staying analog, away from technical things as much as I can. There starts the dilemma.

I look at a flower, a beautiful one, a voice inside me shouts – take a picture, take a picture. I cave to the digital world. I put the flower in the digital jail.

I run next to the river, I turn on my running counter and the Spotify music App, the analog me reminds the digital me that running is to connect with the nature – focus on the beautiful views of Dresden but no, I do not get my rhythm without the music.

I visit friends, I check my phone not to miss messages from other friends. I corrupt the times spent with digital interventions. The analog me wants to live in the moment, the digital me is too impatient to stay calm.

Me without bound

In a 16–17-hour day, 10-12 hours go by looking at computers or phone and a good part of remaining goes by thinking about the times spent with these gadgets or pondering over the stress given by them. I ask myself how it was before 2000 - the times we spent without digital interventions, the friendships we made before that.

Yes, the connections were limited, anxiety was due for near and dear ones during travels. Life was in a bubble with knowledge from books and people you know – but do we need to forget those times completely specially the ones who lived through them? I remember, in my bachelor's hostel, we used to play crickets after coming back from class. The moment we had computers, we started watching movies instead of cricket. Technology has become our best friend and enemy at the same time with human involvement sprinkled over it. We still think about others but is it about them or their digital footprints/expressions?

I do not know the answers. Only time will tell. Once, in a long hiking trail with no cellular network for 5 days, I remembered how concentrated I was on the path, on the experience while absorbing the natural surroundings and the discussions with fellow hikers. Nothing seem to be missing. In a million years of history of humans, 25 years can not change us. We are still the analog ones – the ones who are going through a phase of digital and by core, still analog. I just wish we do not get lost in our digital presence and above that, compromise for that. In the optimistic part of my analog mind, I know we won't.

Endless

Picture : Shatabda Saha

Dresden Spricht Viele Sprachen

Yvonn Spauschus

Wenn man in Dresden durch die Straßen geht, in der Bahn sitzt oder im Supermarkt an der Kasse steht, es hört sich anders an, als noch vor zwanzig Jahren. Ein bunter Sprachenteppich breitet sich vor unseren Ohren aus. Der fränkisch redende Beamte, die arabische Verkäuferin, der indische Ingenieur, die spanischen Restaurantbesitzer, die vietnamesische Frau im Blumenladen, der russische Arzt oder der schwäbische Zugbegleiter.

Längst sind wir nicht mehr nur eine Kultur, wir sind komplexer, kreativer und wandelbarer und vernetzter geworden. Es gibt keine festen Grenzen, die sich durchdringen und ineinanderfließen. Dresden wird zunehmend von einer Vielzahl an Kulturen geprägt und jeder von uns ist ein einzigartiger Identitätscocktail. In Dresden leben Menschen aus aller Welt. Jeder bringt seine eigene Sprache und Kultur mit. Das Ankommen ist für die Einen einfach und für die Anderen schwieriger. Schon unser kleines Wörtchen "nu" ist für viele Nichtdresdner ein erster Stolpertein. Dieses Wort gibt es weder in Hamburg noch im Deutschkurs.

Sprache ist mächtig. Sie regelt unsere Beziehungen untereinander. Sie bestimmt wer mächtig oder machtlos ist. Wer eloquent genug ist, kommt meist schneller ans Ziel, als der dem die Sprache noch fremd ist. (Besonders gilt dies für Institutionen und Ämter).

Wieviel Macht hat Sprache? Welche Botschaften werden uns im kommenden Jahr von Plätzen und Straßen von tausenden Plakaten gesendet werden? Wer versteht sie wie?

Alle diese Gedanken haben uns dazu geführt, das Projekt „Dresden spricht viele Sprachen“ ins Leben zu rufen.

Also wie schaffen wir es uns gegenseitig zu verstehen und uns auszutauschen?

Die Sprache allein ist nur ein Puzzlestein. Wir verstehen uns auch über Blickkontakte, über Gesten und über gemeinsames kreatives Tun.

Kreativität ist immer noch der beste Schlüssel um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Gesagt, getan? Unser Team, vom Verein Kultur aktiv e.V., setzte sich zusammen. Und wir haben überlegt welche niederschwellige Begegnungen können wir schaffen. Was ist das verbindende sprachliche Element, welches Kulturen übergreifend gilt: Sprichwörter und Redewendungen, Jahrhunderte lang erfahrene Lebensweisheiten. Kleine Sprachbilder, die jeder von zu Hause mitbringt. Und diese Sprichwörter waren eine fantastische Brücke um mit ganz vielen Kulturen in Kontakt zu kommen. Wir waren bei Straßenfesten, Nachbarschaftstreffs, in kleinen Sprachtreffs und bei großen Events. Wir haben eingeladen, dass sich die Leute mit zu uns an den Tisch setzen und erzählen. Jeder war aufgefordert ein Sprichwort aus seiner Heimat aufzuschreiben, zu illustrieren und darüber zu erzählen. Und es ist etwas ganz wunderbares daraus entstanden. Ein bunter Teppich an Weisheiten aus aller Welt. Vor allen Dingen haben wir gelernt, wie sehr wir uns doch ähneln. Wie sehr diese Jahrhunderten alten überlieferten Texte in allen Kulturen gleich sind. So haben wir gelernt, dass es in Deutschland Bindfäden regnet, in Frankreich die Kuh pinkelt, in England regnet es Hunde und Katzen und in Syrien öffnet sich das Meer. Wie ist das eigentlich in Indien? Diese Sprichwort haben wir noch nicht erfahren. Beim Weben dieses Sprachenteppich, haben wir Menschen kennengelernt, die uns eingeladen haben. Wir waren neugierig

auf die Menschen, die schon lange hier leben, aber in einem anderen Land geboren sind. Menschen, die eine andere Muttersprache haben und sich dennoch hier zu Hause fühlen.

So haben wir auch Papiya und Amit kennengelernt. Für uns war es eine ganz wunderbare Begegnung. Und weil man über gute Dinge reden sollte, werden Amit und Papiya, Phill aus Australien, Monika aus Polen, Rafael aus Rumänien, Ameer aus Irak, Fa aus Senegal, Sandor aus Ungarn, Oskar aus Mexiko, Si aus China und viele andere mehr als Botschafter für die Vielfalt der Sprachen und Kulturen stehen. Eine Ausstellung entsteht und ein kleines Buch gedruckt. Wir wollen zeigen wie vielfältig Dresden doch sein kann und dass man nur aufeinander zugehen muss.

Wenn Sie Interesse haben an unserem Projekt mitzumachen, sind sie herzlich eingeladen : https://kulturaktiv.org/dresden-spricht

Der Kultur Aktiv e. V. wurde 2002 in der Dresdner Neustadt zur Förderung von Kunst und Kultur gegründet. Seitdem wurde er zu einer Organisation ausgebaut, die sowohl lokal, als auch regional und international zu vernetzen und zu präsentieren weiß. Wir sehen unser Streben zugleich als Beitrag zur Stärkung zivilgesellschaftlicher und demokratischer Strukturen und Werte an.

Montagscafé

বিপ্লবের বিয়ে

সুজিত সিকদার

বিপ্লব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, যার সবচেয়ে বড় শখ ছিল বন্ধুদের নিয়ে মজা করা। সে প্রায়ই তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত এবং নানা ফাঁদ পাতত। প্রথমদিকে সবাই মজা পেলেও, ধীরে ধীরে তারা বিরক্ত হতে শুরু করল। তাই বন্ধুরা মিলে ঠিক করল, এবার বিপ্লবকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

বন্ধুরা মিলে একটা পরিকল্পনা করল। তারা স্থানীয় একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল, যেখানে লেখা ছিল: "বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র বিপ্লব বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে, যে তার শিক্ষার খরচ বহন করতে পারবে। আগ্রহী পাত্রীরা সরাসরি তার ছাত্রাবাসের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন"। বিজ্ঞাপনে তারা বিপ্লবের ছাত্রাবাসের নম্বরটি দিয়ে দিল।

পরের দিন থেকেই বিপ্লবের ছাত্রাবাসের ফোন বেজে উঠতে লাগল। ছাত্রাবাসের দারোয়ান ফোন ধরে প্রতিবারই জোরে জোরে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "বিপ্লব, তোমার ফোন এসেছে! কোনও এক পাত্রীর বাবা-মা ফোন করেছেন!"

প্রথমবার শুনে বিপ্লব কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু যখনই সে ফোন ধরতে গেল, তখন একের পর এক বাবা-মায়েরা তাকে তাদের মেয়ের সাথে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিতে লাগলেন। বিপ্লব হতবাক হয়ে পড়ল এবং ভাবতে লাগল, "এ কী হলো? আমি তো এমন কিছু করিনি!"

বিপ্লবের বন্ধুরা সবকিছু শুনে চুপিচুপি হাসতে লাগল। একসময় বিপ্লব যখন তাদের কাছে সব জানতে চাইল, তখন বন্ধুরা তাকে বলল, "তুমিই তো সবসময় আমাদের নিয়ে মজা করো। এবার আমরা তোমাকে একটু মজা দিলাম!"

বিপ্লব খুব লজ্জা পেল। সে বুঝতে পারল, সবসময় অন্যদের নিয়ে মজা করা ঠিক নয়। তার মজা এবার তার জন্যই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে, আর কখনও এমন মজা করবে না যা অন্যদের কষ্ট দেয়।

এরপর থেকে বিপ্লব তার বন্ধুদের সম্মান করতে শিখল, এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও মজবুত হলো। বিপ্লবের মনে হলো, এই অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক শিক্ষা দিয়েছে।

শিক্ষা মজা করতে গিয়ে কখনও এমন কাজ করা উচিত নয়, যা অন্যের অনুভূতিকে আঘাত করে। একদিন সেই মজা নিজের জন্যই সমস্যার কারণ হতে পারে।

ক্ষোভ

জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী

রক্ত ছড়ানো শব
রক্ত চোষা শোষক
পাশব শাসক
গণতন্ত্রের ঢালে
গণতন্ত্রের ভক্ষক
রাজনীতির খেলায়
বোকাপ্রাণ খায়
বুক চাপড়ায়
স্বজনহারা মানুষ
এখন
গড়াগড়ি রাস্তায়।
চোখ খুলে গেছে
বুক ভেঙে গেছে
গড়িয়েছে অনেক রক্ত।
গলা কাটা প্রাণ
সাড়া তুলেছে
রাত্রি জাগানোর শব্দ।
তোরা যে যা ভাবিস ভাব
কুলাঙ্গার,
ডান বাম রাম মা মাটি
মানুষ একাকার,
আমরা দুর্নিবার,
নেই কোনো রঙের
কালোকারবার,
লাল নীল সবুজ
জমাট বেঁধে
বারুদের পাহাড়,
খবরদার খবরদার
সাড়া ফেলছে সারা পরিবার
হও সাবধান
বহু জান প্রাণ
টেনে নেবে
লাল খড়্গ।
লাশের স্তুপে
ভরে যাবে সব
লাশেদের পচা
মর্গ।

স্বাধীনতার একাত্তর

দেবশ্রী চ্যাটার্জী

মানবিকতা এক হয়ে
সব আজ এসেছে
রাস্তায় নেমে,
বছর শেষে থমকে না যায়,
ওই মেয়েটির ফটো ফ্রেমে।
যেদিন আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারবো রাতদিন,
সেদিন থেকে বুঝবো আমরা
সত্যিকারের হলাম স্বাধীন।
নাহলে তো
"স্বাধীনতার একাত্তর
প্রহসনেরই নামান্তর।"

তিলোত্তমা
অঙ্কন : Disha Costa

Feliz Carrera

Rosa Hauch

Um es gleich vorwegzusagen, der Marathon in Valencia ist nichts für dich, wenn du in aller Stille laufen möchtest. Spreewald ist okay, Himmelswegelauf, Fehmarnmarathon, alles super. Doch mit der Partymeile Valencia nicht zu vergleichen.

Warum auch immer Bimbo – der Spaß vor der Freude.

Das fängt schon beim Frühstückslauf an. Gelaufen wird im Turia-Park. Alle bekommen die gleiche Startnummer mit dem Datum des Frühstückslaufes. Wie so oft, sind die Italiener am zahlreichsten vertreten, die Frauen im rosa Shirt, die Männer in blau, mit Flagge und bester Stimmung. Das ist der Moment, wo wahrscheinlich jeder Italiener sein möchte, so ansteckend ist die gute Laune. Bei anfangs frischen 8-10 Grad machen wir uns auf die 5 km-Schleife durch diesen wunderbaren Park. Er hat Wege für Läufer, Radfahrer, Spaziergänger, Sportflächen für Fußball und andere Mannschaftssportarten, Trinkbrunnen, Kilometeranzeigen, WC-Anlagen, öffentlich und für jeden erreichbar, Orangenbäume, Skulpturen, kleine Kneipen, große und kleine Spielplätze, einfach Platz für jeden, der Entspannung, Sport, Musik oder Leute sucht.

Nach zwei Kilometern merken alle Frostbeulen, dass Mütze und lang-lang doch etwas übertrieben waren. Kommt die Sonne, kommen 20 Grad und du kannst den Rest des Weges schön warm genießen. Im Ziel gibt es Sandwiches, Wasser, Obst, Energiedrinks - Frühstück eben. Moderation, internationales Stimmengewirr, Musik, Sonne, alles passt und stimmt auf den Marathontag ein.

Race-Day 2023/12/03

Für mich beginnt der Tag um 6 Uhr, anziehen, Startnummer, zwei Viertelliter-Softflaschen mit verdünntem Gel füllen und der Versuch, zu frühstücken. Hat bis auf eine Tasse Kaffee und die Hälfte eines halben Brötchens mit Butter nicht geklappt, obwohl das Buffett des Hotels reichhaltig ist und auf Läufer vorbereitet ist. Es ist mein 25. Marathon und fühlt sich an wie der erste. 2019 hatte ich in Chicago die Sixstarmedaille bekommen. Dann kam Corona 1 mit vier virtuellen Läufen, Corona 2 mit Null-Bock-auf-gar-nix-alleine und 2022 mit Jetzt-ist-es-auch-egal, laufe- ich-eben-alleine, aber-Training-muss-sein. Der Jubiläumslauf fühlte sich ganz neu an, als ob ich das noch nie gemacht hätte.

Zum Start kannst du zu Fuß gehen vom Hotel Barcelo aus. Es ist allerdings weiter als gedacht. In der Startwelle haben wir schon gelästert, ob die gegangenen reichlich drei Kilometer mitzählen. Schilder leiten dich. An jedem Welleneingang sind Toilettenhäuschen aufgestellt. Noch ist es frisch und ein Poncho schützt perfekt. Den kannst du später am Straßenrand lassen.

So, jetzt gehts los. Musik, Countdown und ab über die Brücke, am Hotel vorbei, zum Hafen und immer so weiter. Langweilig wird es nie. Überall ist Musik. Da die Straßen nicht so breit wie in Amerika sind, ist man auch niemals alleine.

Mir gefällt das. Bis Kilometer 30/35 läuft alles am Schnürchen. 10 Kilometer, eine Stunde. Für mich ist das super. Doch dann wird die Batterie langsam leer. Die aufgelösten Gels haben mir gut geholfen und auch vier Schwedentabletten sind dringeblieben. Doch noch kann ich den kompletten Marathon nicht quasi nüchtern laufen. Ist aber auch nicht schlimm. Jetzt kann ich abschätzen, dass ich die Zielzeit von 5 Stunden 30 mit Sicherheit erreiche und nicht ohne Medaille nach Hause fliegen muss. Also kann

ich den Rest genießen. Ein Stück trabe ich noch mit der 4:30er Gruppe mit und lass dann abreißen. Die letzten zwei Kilometer gehe ich durch Valencia spazieren und genieße die unbändige Fröhlichkeit, die Sonne und den Zieleinlauf. Erst zwei Tage später realisiere ich, dass wir in der Wissenschaftsstadt “übers Wasser” gelaufen sind. Okay, das kann ich also auch. Der Bereich, der sonst Wasserfläche ist, wurde mit Traversen und Matten zum unglaublich stimmungsvollen Zieleinlauf umgebaut. Im Ziel gab es erst eine Flasche Wasser, dann mussten wir noch eine gefühlte Ewigkeit gehen, bis es endlich die Medaille gab. Ein bisschen spät für die Emotionen. Doch jetzt war sie da.

Bereite dich gut vor, wenn du spezielle Verpflegung brauchst. Manchmal gibt es unterwegs viel zu große Flaschen, manchmal Pappbecher mit Wasser, manchmal kleine Flaschen. Trockenaprikosen möchte ich beim Laufen nicht. Die sorgen für prompte Verdauung. So bin ich gut und ohne Toi-Stopp durchgekommen.

Am Ende stehen 4:39 auf der Uhr. Das war ein schöner Lauf ins 6.Jahrzehnt in einer Stadt, die jederzeit eine Reise wert ist.

Introduction to Future

Eshaan Shyamal

"Everything has its wonders, even darkness and silence…" – Helen Keller

We all know our history, how the Earth was formed, how life appeared on Earth, how we humans came, etc. But what does our future look like? How will the universe meet its end? We will never be truly certain. Science has begun to prepare a stunning picture of how the future might unfold. So, now, let me take you to the end of time. We will travel through time at a steady and rapid rate. This vision of the future will surely evolve as we search for more clues.

The Anthropocene Era may last till the Earth's magnetic field flips. A drastic sea level rise will be observed, followed by numerous asteroids impacting the Earth. From 15,000 to 22,500, the most unexpected change will occur on Earth—The Sahara will become tropical. The enormous red giant star Betelgeuse will unfortunately turn into a supernova from 1,532,000 to 1,590,000.

In the future, a deadly gamma-ray will burst, Mars's moons will have a ring at the same time when Saturn's rings vanish. But now I think the end is nearer as the Sun increases luminosity. As it begins to run out of fuel, photosynthesis will cease; it will not simply fade away. All plant life will die, oceans will evaporate, its core will collapse, and the extra heat it generates will cause its outer layers to expand. Then the sun will become a red giant. As it is said, everything is not eternal.

The Earth will get destroyed to rock and dust by the dying sun, resulting in the extinction of the solar system. The Sun will become a White Dwarf. The stars will run out of fuel and will slowly turn off one by one, leaving the universe to cool down on its own. No more new stars will be created. And so, the universe will end not with a bang but with a whimper and not with fire but with ice as slowly the last red dwarfs will cease to exist. The universe will become a cosmic boneyard, spread with remnants of ceased stars.

In the degenerate era, some brown dwarfs may collide, making accidental new stars. Some remaining neutron stars may collide, puncturing the darkness with their super bright supernova. Any existing life form may exist around the white dwarfs, but, as we know, they will also fade and die eventually, resulting in black dwarfs. Black dwarfs are dense, very cold, decaying balls of degenerate matter.

The things I was talking about were all about stars and Earth, but I have not even come close to the black holes. The black hole will swallow stray matter, eventually flaring up in a blaze of glory. After billions of years have passed, the expansion of the universe accelerates, spreading matter apart faster than the speed of light, resulting in the expansion of spacetime. Current theories predict that atoms will begin to decay, eventually destroying all remaining matter in the universe. During the black hole era, black holes will become the fundamental building blocks of the universe. A galaxy will basically be a supermassive black hole at its center, with other black holes orbiting it. In this age, black hole mergers will become the main event.

Scientists used to think these beasts are immortal, but they also die one day. After quadrillions of years, they will evaporate in a gigantic explosion, and then there will be nothing left in the universe. Quantum Mechanics has allowed particles and radiation to escape the ultimate prison—a Black Hole.

As they die, they light up the universe once again for a very short amount of time, like fireworks in a clear night sky. As the black holes slowly die off, the universe continues to expand, driven by a mysterious force that we do not yet understand. So, we assume that the universe is inflated by dark matter.

So, we think the universe will die in ice because it's speeding out of control. The weird stuff that's accelerating the universe is called “dark energy.” And this stuff is the dominant substance of the universe; about ¾ of the matter-energy content of the universe is this dark energy, and we do not know what it is. So, what is the future of the universe?

Well, if this dark energy remains dominant and repulsive, the universe will expand forever, faster and faster with time—a runaway universe—70 percent of the energy of the universe resides in empty space, and we do not understand the cause. We do not know because we don't understand the nature of dark energy.

Discovering the true nature of dark energy could change our vision of the future dramatically. If it somehow weakens over time, the universe could collapse under gravity—“A big crunch.” Given a boost, it could tear the universe apart at the seams — a “big rip.”

Some speculate that there may be a way to escape our universe before entropy erases everything. There will be only one more supermassive black hole left in the universe. As this one evaporates, leaving the universe on its own, it will bathe the universe with light one last time before disappearing. Once the very last remnants of the stars have finally decayed away to nothing, and everything reaches the same temperature, the story of the universe finally comes to an end. For the first time in its life, the universe will be permanent and unchanging; entropy will finally stop increasing because the cosmos cannot get any more disordered. At this point, time becomes meaningless forever—nothing happens, and it keeps not happening forever.

“Everything has its wonders, even darkness and silence… and I learn, whatever state I may be in, therein to be content.” – Helen Keller

TU Dresden : জ্ঞানের সেতুবন্ধন

সৌরভ দেব

ড্রেসডেন শহর, যাকে অনেকেই তুলনা করে থাকেন রূপকথার ফিনিক্স পাখির সাথে। ফিনিক্স পাখি, যে একটা সময়ে এসে নিজেই নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারপর সেই ছাই থেকেই আবার নতুন করে পুনর্জন্ম নেয়। না, ড্রেসডেন শহর নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে দেয়নি। এটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। অথচ এ শহরে কোনো বড় শিল্প কারখানা বা রণ-শিল্পের সাথে জড়িত তেমন বড় কোনো প্রতিষ্ঠানই ছিল না। স্রেফ ক্ষমতার দম্ভ দেখাতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছিল ব্রিটিশ বিমান বাহিনী। এই ধ্বংসস্তুপের মধ্য দিয়ে ফিনিক্স পাখির মত ঘুরে দাঁড়ায় ড্রেসডেন।

Technische Universität Dresden অথবা ইংরেজিতে বললে Dresden University of Technology এই শহরেই অবস্থিত। সাক্সনি রাজ্যের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় এটাই। ড্রেসডেনে এই ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৮ সালে। অবশ্য তখন এর নাম ছিল রয়্যাল স্যাক্সনি টেকনিক্যাল স্কুল। এর সুনাম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৭১ সালে একে পরিণত করা হয় রয়্যাল সাক্সন পলিটেকনিক্যাল কলেজে, সেই সময়ে যার মর্যাদা ছিল অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই। ততকালীন সময়ের খ্যাতিমান থার্মোডায়ানামিক্স প্রকৌশলী গুস্টাভ সয়নারকে নিয়োগ দেয়া হয় প্রথম ডিরেক্টর হিসেবে। মজার ব্যপার, আমি নিজেও এই লেখাটা লিখেছি তাঁর নামেই নামকরণ করা সয়নার বিল্ডিং এ বসে।

TU Dresdenএর campus

১৮৭৩ সাল থেকেই শুধু বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ভাষাতত্ব, কলা ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও জেনারেল সাইন্স বিভাগের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য এবং এধরণের আরো অনেক বিষয়কে। ১৮৮৩ সাল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিল নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক। কারণ এ বছর থেকেই প্রথম এই নিয়মটির প্রচলন করা হয় যে, 'এখন হইতে মাস্টার্স ডিগ্রি নিতে হইলে ফাইনাল ইয়ারে একখানা থিসিস লিখিতে হইবে'।

১৮৯০ সালে আরেক ধাপ প্রমোশন পায় এই প্রতিষ্ঠানটি। পলিটেকনিক্যাল কলেজ থেকে রয়্যাল সাক্সন টেকনিক্যাল কলেজ-এ উত্তীর্ণ হয় এটি। কার্ল আর্নেস্ট হার্টিগকে নিয়োগ দেয়া হয় রেক্টর হিসেবে। কথাপ্রসঙ্গে বলে রাখা যায়, ইউরোপীয়ান সিস্টেমে রেক্টর হল আমাদের ভিসির সমতুল্য। সে হিসেবে কার্ল আর্নেস্ট হার্টিগ হলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম রেক্টর। এই সময়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০, যার মধ্যে ২৮ জন ছিল বিদেশী। ১৯০০ সালে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করে এই প্রতিষ্ঠান। ফ্রেডরিখ সিমেন্স ছিলেন প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া ব্যাক্তি যিনি ছিলেন বিখ্যাত Siemens পরিবারের সন্তান।

ভালভাবেই চলছিল এর দিন। কিন্তু প্রকৃতিরই বিধান দিন কারো সমান যায় না। ড্রেসডেনের ভাগ্যেও এসে জুটল দুঃসময়। ১৯১৪ সালে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যায় কলেজের ৩২২ জন সদস্য। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া শুরু হয়। ঢেলে সাজানো হয় এর প্রশাসনকে। প্রথমবারের মতো ফ্যাকাল্টি সিস্টেম চালু করা হয়। কিন্তু ভাগ্য তাকে বেশি সময় দিল না। আবার শুরু হল যুদ্ধ। এবার এলো সেই ভয়ঙ্কর দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ইতিহাসে এই দিনটি এবং পরের দুটো দিন পরিচিত ড্রেসডেন ডিসেস্টার হিসেবে। মিত্র বাহিনীর নির্বিচার বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় শহরের বেশির ভাগ। চার হাজার টন হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা আঘাত করে যায় ড্রেসডেনকে। প্রায় ২৫০০০ মানুষ মারা যায় এতে। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাও এর বাইরে ছিল না। এই যুদ্ধ শেষে সোভিয়েত বাহিনী দখল করে নেয় টেকনিক্যাল কলেজ। ১৯৪৬ সালে ৪৯১ ছাত্রছাত্রী নিয়ে আবার শুরু হয় যাত্রা।

অবশেষে ১৯৬১ সালের ৫ অক্টোবর আরেকটি বিশেষ দিন হয়ে এল। এই দিনই পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে প্রতিষ্ঠানটি। মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রগামী ছিল TU Dresden। যদিও সোভিয়েত ভেঙ্গে যাবার পর এবং জার্মানির একত্রীকরণের পর মেকানিক্যাল ক্ষেত্রটির অগ্রগতিও থেমে যায়। এই সুযোগে অনেকটা লাফিয়েই কয়েক ধাপ এগিয়ে যায় ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ। বর্তমানে পুরো ইউরোপের সিলিকন শিল্পের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বলা হয় ড্রেসডেনকে। এরই ফলে এখানে স্থাপিত হয় অনেক ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানি, যার সংখ্যা এখন প্রায় ৩০০ এবং প্রায় ৪০০০০ এর উপর মানুষ কাজ করেন এখানে। USA এর সিলিকন ভ্যালির সাথে তুলনা করে একে বলা হয় সিলিকন সাক্সনি। যদিও সিলিকন ভ্যালির সমতুল্য হতে হলে একে পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ।

যাক ওইসব। অনেক বোরিং ইতিহাস কপচালাম। এবার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা বলি। প্রথম কথা হল এর সবই ভাল লাগতো। শুধু ভাল লাগতো না সকাল ৭-৩০ মিনিটে ক্লাস শুরু করাটা। গ্রীষ্মে তাও মানা যায়, কিন্তু শীতকালে যখন সূর্যই ওঠে ৮টা-৯টার দিকে তখন এই ব্যাপারটা যে কিরকম বিরক্তিকর তা বলে বোঝানো সম্ভব না। সাড়ে সাতটার ক্লাস ধরতে যখন ৬টায় উঠে দেখতাম বাইরে ঘুটঘুটে আঁধার তখন মনে হত ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

মাস্টার্স স্টুডেন্ট হিসাবে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে। সেই যাত্রা এখন চলছে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে। ভালো খারাপ সবকিছু মিলিয়ে ১০ বছর কাটিয়ে দিলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। জানি না কতদিন থাকা হবে এই ক্যাম্পাসে। কিন্তু এই স্মৃতিগুলো মনের একটা বড় জায়গা জুড়ে যে সবসময়ই থাকবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

পুনশ্চঃ এই লেখার শিরোনামটি ভার্সিটির শ্লোগান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নেয়া। যেটা হলো, "Wissen schafft Brücken" বা "Knowledge builds bridges"।

TU Dresdenএর SLUB

অপেক্ষা

চৈতী সিকদার

১

স্কুল শিক্ষক বাবা আর গৃহিণী মায়ের দ্বিতীয় সন্তান আমি জয়ী। মফস্বলে একটি কাঁচা পাকা ঘরে আমার বেড়ে ওঠা। ছোট থেকেই পড়াশুনা আমার একমাত্র প্রেম। কিছুটা শান্তস্বভাব আর পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সবার কাছেই হয়ে উঠলাম গর্বের পাত্রী। সবার ভালোবাসা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল ডাক্তারীর ভর্তি পরীক্ষার প্রথম অবস্থান। নিজের সহ সবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আরো মরিয়া হয়ে উঠলাম। কলেজেও বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছি নবীনবরণ অনুষ্ঠানে, বিশেষত আমার নৃত্য উপস্থাপনের মাধ্যমে।

সেই সূত্রেই ইদানিং হঠাৎ হঠাৎ অপরিচিত নম্বরের ফোনে বড্ড বিরক্ত আমি।

আবার একটি অপরিচিত নম্বর। ভাবলাম বলবো 'ধরে দেব এক ঝার'। কিন্তু ওপাশ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটা আমায় শান্ত করে দিল।

যতটা রাগ ছিল তার দ্বিগুন ভদ্রতার সহিত বললাম, কে বলেছেন?

নামটা না বলেই আমার নৃত্যের কিছুটা প্রশংসা করলেন ভদ্রলোক। আমিও বেশ আপ্লুত হলাম।

কিছুদিন পরে আবার ফোন। এবার আর ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যটা বুঝতে বাকি রইল না। এর মাঝেই কলেজে কানাঘুষো শুনেছি, আমার ডিপার্টমেন্ট প্রধান স্যার নাকি আমাকে তার ঘরের বৌমা করতে চাইছেন।

— হ্যালো জয়ী ?

— হ্যালো, আপনার নামটা তো জানা হলনা।

— জয়ন্ত।

নামটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলাম। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,

— বলুন।

— জয়ী, তুমি কি জানো, আমার বাবা তোমার বাবা হতে চায়।

শান্ত হয়ে জবাব দিলাম,

— স্যার তো আমার শিক্ষক, বাবার মতো।

জয়ন্ত বলে চললো,

— বাবা সারাজীবনের জন্য তোমারও বাবা হতে চায়। জানো জয়ী, সেদিন আমি অনুষ্ঠানে যেতে চাইনি, বাবা জোর করে নিয়ে গেল। তোমাকে দেখার পর তুমি আমার সব কিছুতে চলে এলে। পরে একদিন বাবার কাছে তোমার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। বাবা কি বললো জানো? বলল যে, তোমাকে দেখাতেই নাকি উনি আমাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিল। এটাই নাকি বাবার উদ্দেশ্য ছিলো। এখন মনে হচ্ছে, না গেলে তো চরম ক্ষতি যেতো আমার!

একটু রাগত ভাবে বললাম,

— আপনার কথা শেষ হল তাহলে! এবার আমি বলি, এই যে মিষ্টার, আপনার সাথে কিন্তু আমার কোনো বন্ধুত্ব নেই। তাই একটু ভেবে চিন্তে বলুন কথাগুলো। বুঝলেন?

অথচ জয়ন্ত আগের মতোই বলে চললো,

— আসলে এতোদিন অপেক্ষা করেছি তো। আর মনেই হয়না যে তোমার সাথে আমার কথা হয় নাই। একা একা তো তোমায় কত

কথাই বলেছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম,

— যাই হোক। কি বলছেন আপনি এসব? জনেনই তো, এটা সম্ভব নয়।

— কেনো জয়ী?

— সমাজে বেশি পার্থক্যের কোন কিছু শোভনীয় নয়।

জয়ন্ত অবাক হয়ে বলল,

— পার্থক্য! মানুষের সাথে মানুষের পার্থক্য হয় নাকি জয়ী?

এই কথোপকথনের মাস দুয়েক পরে আমাদের দুজনের পারিবারিক ভাবে বিয়ে ঠিক হল।

২

এর পরে কাটে কলেজ জীবনের মধুর চারটা বছর। জয়ন্ত অন্য শহরে থাকে, প্রতিমাসে একবার আসে।

একবার আমার আর জয়ন্তর প্রচন্ড অভিমান। সম্পর্কটা একেবারে সমাপ্তির পথে। হঠাৎ একদিন স্যারের ফোন, বাসায় যেতে হবে, মণিমা দেখতে চেয়েছেন।

সেদিন গিয়ে যা দেখলাম, তা এই সমাজের প্রত্যেকটা মেয়েই স্বপ্ন দেখে। জয়ন্ত এসেছে, ওকে দেখে ইচ্ছে করছিল অনেক কথা বলতে, কিন্তু বললাম না। মণিমা আমার আর জয়ন্তের সব পছন্দের খাবার রান্না করেছেন, খেতে বসে গল্প করতে করতে কখন যে অভিমান ভুলে গিয়েছিলাম সেদিন!

খাওয়ার পরে টিভি দেখছি আর নিজের ভাগ্যকে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে ঘুম এসেছিল। হঠাৎ কানে বেজে উঠল সেই সুমধুর ধ্বনি,

— জয়ী....

আমার আকাশ বাতাস কম্পিত হল সেই ধ্বনিতে। যেন এক যুগ অপেক্ষার পরে শুনতে পেলাম এই সুমধুর বাণী। দৌড়ে গিয়ে জয়ন্তর বুকে মারতে মারতে বললাম,

— কি করে পারলে এতোগুলো দিন কথা না বলে?

জয়ন্ত বললো,

— তুমিও তো বলোনি।

আমার অভিমানী জবাব,

— তুমিও ফোন করনি।

বলেই কান্না করে দিলাম।

জয়ন্ত বলে চললো,

— পাগলি মেয়ে, আর হবেনা। কোন দিন নয়। ঝগড়া করব, কিন্তু কথা বন্ধ করব না। কাঁদে না পাগলিটা।

চার বছর পরে এক শুভ দিনে আমরা দুজন অগ্নি সাক্ষী রেখে এক হলাম। এতোদিনের সপ্ন সত্যি হল। দুজন দুজনকে হারানোর ভয় চিরতরে দুর হল।

৩

স্বপ্নের মতো দিন যাচ্ছে আমাদের। হটাৎ একদিন জয়ন্ত আর আমি বাইরের থেকে ঘরের দরজার কাছে আসতেই ভেতর থেকে শুনতে পেলাম মণিমার কথা,

— আমাদের তো পছন্দ ছিল না। তোমার জন্য টিনের ঘরে বেড়ে ওঠা এক মেয়ে আজ আমার ছেলের বৌ। লজ্জায় মরে যায ছেলেটা আমার! হ্যাংলা একটা মেয়ে নিয়ে কি তার সারাজীবন কাটবে?

আমি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

— তোমাদের পরিবারের কারোর মধ্যে কোনো অশান্তি চলছে কি ?

— না জয়ী। মা আমার কথাই বলছেন।

অবলীলায় বলে গেল জয়ন্ত। একবারও ভাবলো না, কাকে বলছে, কি বলছে।

তারপরও বিশ্বাস করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম,

— মণিমা, আমার অপরাধ কি?

উত্তর পেলাম,

— তুমিই একটা সমস্যা।

জয়ন্তর দিকে তাকাতেই বললো,

— মা কখনো অমূলক কিছু বলেন না।

শেষ ভরসা নিয়ে বাবার দিকে তাকানোর আগেই বললো,

— সহ্য করো। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

৪

সেই একদিনের অপেক্ষায় মায়ের কাছে চলে আসলাম। অপেক্ষার প্রহর গুনি, স্বপ্ন দেখি, জয়ন্ত এসে বলবে,

— এই পাগলি, আমায় রেখে চলে আসলে কি করে!

জয়ন্ত আসলো না, আসলো ডিভোর্স পত্র। ওটাকে বুকে জরিয়ে জয়ন্তর স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করলাম। ঘুমানোর চেষ্টা করলাম জয়ন্তর ছোঁয়া নিয়ে, তাও পারলাম না। প্রতিদিনের ওষুধটা আজ কিছুটা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এ কি হল? ঘুম এলো না আমার, চারদিক কেমন নিরব হয়ে এলো। হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে আমার, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মা কাঁদছে, শান্তনা দেয়ার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই আমার।

৫

কয়েকদিন পরে অনেক মানুষ এসেছে আমায় দেখতে, আমি এখনো জয়ন্তর অপেক্ষায়, জয়ন্তর হাতে সাজার অপেক্ষায়। আমাকে সাজাতে সাজাতে জয়ন্তর চোখের দুফোঁটা জল পড়বে আমার কপলের উপরে, সেই তৃপ্ততাটুকু গ্রহণের অপেক্ষায়। কিন্তু জয়ন্তর নয়, কপালে জল পড়লো মা-কাকীমাদের। তাদের চোখের জলে আমার আর ভালো করে সাজা হলনা। মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে সবাই আমাকে স্বার্থপর বলছে। কিন্তু আমি তো নিরুপায়! মাগো, আমায় ক্ষমা করো মা।

দ্যাখো মা, আমি চলে যাচ্ছি স্বর্গে। পৃথিবীতে যে স্বর্গ গড়ার কথা জয়ন্তর সাথে দেখেছিলাম, সেই স্বর্গে যাচ্ছি আমি। এখানে অপেক্ষা করছি আমি, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

নাগপাশ

দেবযানী গুহ বসু

সময় যেন থমকে আছে বুকের মাঝে
ভাবনাগুলো যদিও খুব এলোমেলো
সরীসৃপের মতন নাগপাশে ঘিরে ধরে
আচ্ছন্ন আমি আবেগে, তোমার চিন্তায়
এলোমেলো চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে যে তুমি
আমি এগোতে চাই কিন্তু বাঁধন বড় শক্ত
লড়ে লড়ে আমি ক্লান্ত, শান্তি দাও
প্রশস্ত পথ ওই দূরে হাতছানি দেয়
আমি পরে থাকি একপাশে বিধ্বস্ত
মায়াবী এক পাখি শীষ দেয় আনমনে
নাগপাশ আলগা হয় হয়তো ক্রমে ক্রমে
শান্তির দূত অমোঘ টানের হাত বাড়ায় ।

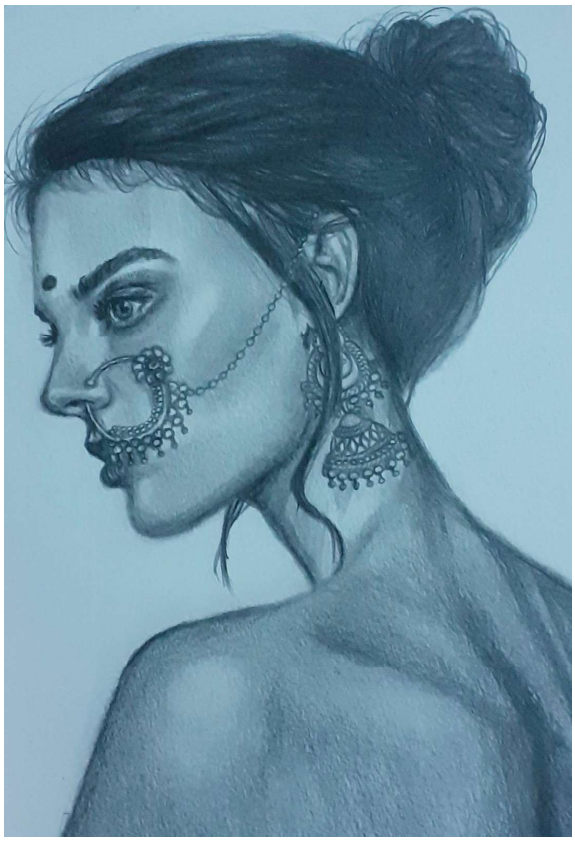

নিঃশব্দ সুন্দর
অঙ্কন : Disha Costa